গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৭ বর্ষ ৪৭ সংখ্যা | ৪ - ১০ জুলাই ২০২৫ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

আইন কলেজে ছাত্রী ধর্ষিতা

দুষ্কৃতীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি

কসবায় দক্ষিণ কলকাতা আইন কলেজে ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনার তীব্র নিন্দা করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ২৭ জুন এক বিবৃতিতে বলেন,

এই ঘটনা আবারও প্রমাণ করল এ রাজ্যের কলেজগুলোতে ছাত্রীদের কতটা নিরাপত্তাহীনতায় কাটাতে হয়। কয়েক মাস আগেই আর জি কর মেডিকেল কলেজে ধর্ষণ ও নৃশংস খুনের ঘটনা ঘটেছে যার ন্যায়বিচার এখনও পাওয়া যায়নি। এটা কারও বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে শাসক-ঘনিষ্ঠ অপরাধীদের সেখানে আড়াল করার চেষ্টা হয়েছে। কসবার বর্তমান ঘটনায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দক্ষিণ কলকাতার নেতা যুক্ত থাকলেও পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেফতারের পর পুরো নাম না প্রকাশ করে আদ্যক্ষর ব্যবহার করেছে। পুলিশের এই ঘৃণ্য আচরণের আমরা তীব্র নিন্দা করছি। আমরা অবিলম্বে এই ঘটনার ন্যায়বিচার ও দুষ্কৃতীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করছি।

ভক্তির নয়, এ রথ ভোটের

কবির কল্পনার রথযাত্রায় সকলকে দেবত্বের দাবিদার হতে দেখে 'অন্তর্যামী' হেসেছিলেন। কিন্তু এবারের পশ্চিমবঙ্গে রথযাত্রা নিয়ে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস বনাম কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপির যে কুৎসিত প্রতিযোগিতা চলল তাতে যে কোনও গণতন্ত্রপ্রিয় এবং সৎ মানুষ ধর্মবিশ্বাসী হলেও তাঁর অন্তর ঘৃণায় ছি! ছি! করে না উঠে পারে না।

মুখ্যমন্ত্রী ছুটেছিলেন দিঘার সদ্যনির্মিত জগন্নাথ মন্দিরে রথ টানতে। তাঁর সাথে পাল্লা দিতে পশ্চিমবঙ্গে অধুনা বিজেপির প্রধান মুখ তথা রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তিন জায়গায় ঘুরে ঘুরে রথ টেনেছেন। এই দড়ি টানাটানির হিড়িকে সরকার এবং রাজ্যের বিরোধী দল হিসাবে বিজেপি উভয়েরই হারিয়ে গেছে গণতান্ত্রিকএবং রাজনৈতিক দায়িত্ববোধ। ধাক্কা খেয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মধ্যে বিরাজ করা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবেশ। কিন্তু এই দুই পক্ষের কেউই এর কোনও তোয়াক্কা করেননি। মুখ্যমন্ত্রী কয়েক মাস আগে থেকেই মেতে আছেন, সরকারি ব্যয়ে নির্মিত দিঘার জগন্নাথ মন্দির নিয়ে। তাঁর তত্ত্বাবধানে সরকারি আধিকারিক, পুলিশ কর্তা সকলে মিলে যেমন করে জোড় হস্তে জগন্নাথ বন্দনায় মেতেছেন তা দেখে মনে হতে পারে এ রাজ্যের প্রশাসনিক সব দায়িত্ব তাঁদের সারা, এখন রথের রশিতে টানটুকু দিতে পারলেই রাজ্যবাসীর জন্য একেবারে স্বর্গসুখ তাঁরা পেড়ে এনে দেবেন। ঘরে ঘরে চাকরির হদিশ না পৌঁছাক জগন্নাথের নামাঙ্কিত প্রসাদ পৌঁছে দিতে গোটা রাজ্য সরকার একেবারে বদ্ধপরিকর। মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর মন্ত্রীকুল ও বশংবদ আমলা-পুলিশ অফিসার সেপাই-সান্ত্রীর

দুয়ের পাতায় দেখুন

কসবায় আইন কলেজের ছাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে রাজ্য জুড়ে ছাত্র-যুব-মহিলারা বিক্ষোভ দেখান। বহু গণসংগঠন, ফোরাম প্রভৃতি সংস্থার পক্ষ থেকেও বিক্ষোভ হয়। ছবি ঃ বাম দিকে কোচবিহার শহরে ও ডানদিকে দক্ষিণ কলকাতা আইন কলেজের সামনে বিক্ষোভ। ২৭ জুন

হাসপাতাল থেকে শিক্ষাঙ্গন

মেয়েরা কোথাওই নিরাপদ নয়!

আর জি কর হাসপাতালের মতো সরকারি স্বাস্থ্যক্ষেত্রই শুধু নয়, পশ্চিমবঙ্গের কলেজগুলিও যে এখন শাসক তৃণমূলের লুঠেরা চক্রের ঘুঘুর বাসা হয়ে দাঁড়িয়েছে, দক্ষিণ কলকাতা ল কলেজে সাম্প্রতিক ছাত্রী-ধর্ষণের ঘটনা তা একেবারে প্রকাশ্যে এনে দিল। আর জি করে চিকিৎসক-ছাত্রীর ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডের এক বছরও পার হয়নি। এরই মধ্যে কলকাতা শহরের বুকে একটি আইন কলেজে ছাত্রীধর্ষণের আরও একটি ভয়ানক ঘটনা দেখিয়ে দিয়ে গেল, শাসক দলের অভয়হস্ত মাথার উপর থাকলে যে কোনও ধরনের অপরাধ করে পার পাওয়ার ভরসা থাকে, কেবল দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের পায়ে উপযুক্ত প্রণামী নিবেদন করতে পারলেই হল। শুধু তাই নয়, এ ঘটনায় প্রমাণ হয়ে গেল, রাজ্যে ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস দাঁড়িয়েই রয়েছে দুষ্কৃতীদের দাপটের উপর ভর করে।

দক্ষিণ কলকাতা আইন কলেজের নির্যাতিতার বয়ানে সে দিনের ঘটনার যে বিবরণ বেরিয়ে এসেছে, বাস্তবেই তা হাড় হিম করে দেওয়ার মতো। গত ২৫ জুন কলেজের প্রথম বর্ষের ওই ছাত্রীকে সন্ধ্যার পরেও ইউনিয়ন রুমে কিছুক্ষণ থেকে যেতে বলে ওই কলেজেরই টিএমসিপি নেতা ও চুক্তি-কর্মী মনোজিৎ মিশ্র— গোটা কলেজে যার অবিসংবাদী দাপট। এরপর তার দুই স্যাঙাৎ জাইব আহমেদ ও প্রমিত মুখার্জীর সহযোগিতায় বন্ধ ইউনিয়ন রুমে মেয়েটিকে হেনস্থা করে মনোজিৎ। আক্রান্ত মেয়েটি আতঙ্কে চিৎকার করতে করতে ইউনিয়ন রুম থেকে বেরিয়ে যেতে চাইলে তাকে জোর করে পাশের গার্ড রুমে ঢোকানো হয়। সেখানে যৌন নিগ্রহে বাধা দিলে তাকে হকিস্টিক দিয়ে মারা হয়। এরপর প্রায় অচৈতন্য মেয়েটিকে বাকি দু'জনের উপস্থিতিতে ধর্ষণ করে মনোজিৎ। পুরো ঘটনা মোবাইলে ভিডিও করা হয় এবং ঘটনা জানাজানি হলে মেয়েটির প্রেমিক ও মা-বাবাকে খুন করার এবং ওই ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেয় মনোজিৎ।

সংবাদমাধ্যম সূত্রে মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্র সম্পর্কে যা জানা গেছে তা চমকে দেওয়ার মতো। দক্ষিণ কলকাতা ল কলেজ সহ কলকাতা শহরের আইন কলেজগুলিতে ছাত্র ভর্তির বিনিময়ে বিপুল টাকা লুটের যে চক্র, মনোজিৎ তার মাথা। নানা কারচুপি করে লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে

দুয়ের পাতায় দেখুন

দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট সফল করুন

সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের আহ্বান

দশটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম শ্রমজীবী মানুষ এবং সকল শোষিত নিপীড়িত জনগণের কাছে ৯ জুলাই সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘট সফল করার আহ্বান জানিয়েছে। সংযুক্ত কিসান মোর্চাও এই ধর্মঘটকে সর্বাত্মক সমর্থন জানিয়েছে। শ্রমজীবী মানুষের জীবনের জরুরি এবং ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলিতে লড়াই তীব্র করার জন্যই এই ধর্মঘট। এই ধর্মঘটের দাবি— শ্রমিকদের দীর্ঘ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে অর্জিত ২৯টি শ্রম আইন প্রত্যাহার করে শ্রমিক স্বার্থবিরোধী, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষাকারী ৪টি শ্রম কোড চালু করা চলবে না। সরকারি সংস্থার বেসরকারিকরণ বন্ধকরা, 'ন্যাশনাল মনিটাইজেশন পাইপলাইন'-এর নামে ঘুরপথে বেসরকারিকরণের হীন কৌশল বাতিল করা, বিদ্যুৎ (সংশোধনী) বিল-২০২৩ বাতিল এবং স্মার্ট মিটার বসানো বন্ধ করা। দাবি উঠেছে, কর্ম সময় বাড়ানো চলবে না, ৮ ঘণ্টার কর্মদিবস এবং সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা শ্রমসময় সুনিশ্চিত করতে হবে, স্থায়ী কর্মী কমানো চলবে না, কর্মীস্বার্থ বিরোধী 'জাতীয় পেনশন স্কিম' (এনপিএস)/ ইউনিফায়েড পেনশন স্কিম (ইউপিএস) বাতিল করে 'নন কন্ট্রিবিউটরি পেনশন' ফিরিয়ে এনে 'পুরনো

৯ জুলাই

সাতের পাতায় দেখুন

● *শিয়ালদহে ধর্মঘটের সমর্থনে প্রচার সভা। বক্তব্য রাখছেন এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস*

মেয়েরা কোথাওই নিরাপদ নয়

একের পাতার পর

যোগ্যতামান নেই এমন ছাত্রদের নাম মেধাতালিকায় তুলে আনত সে। বলা বাহুল্য, প্রতি বছর ভর্তি-দুর্নীতির মাধ্যমে এই বিপুল টাকা তোলার পিছনে শাসক তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের অভয়হস্ত মনোজিতের নিরাপত্তা বলয়ের কাজ করত। এ প্রসঙ্গে সংবাদমাধ্যমে তৃণমূল বিধায়ক অশোক দেবের নাম উঠে এসেছে। বুঝতে অসুবিধা নেই, শুধু উনিই নন, শাসক দলের আরও সব তাবড় নেতাও এর সঙ্গে যুক্ত। দক্ষিণ কলকাতা ল কলেজের ছাত্ররাই জানিয়েছেন, ভর্তির নামে তোলা এই বিপুল টাকার ভাগ তৃণমূলের ভিতরে বহু দূর পর্যন্ত পৌঁছয়। এই টাকার বখরা পেতে শাসক দলের কয়েকটি গোষ্ঠীর মধ্যে রীতিমতো রেষারেষির কথাও উঠে এসেছে। ঠিক সেই কারণেই আইন কলেজের ছাত্রছাত্রীদের একটি অংশ প্রশাসন ও শাসক দলের নানা স্তরে বার বার অভিযোগ জানালেও কোনও কাজ হয়নি।

শুধু ভর্তির নামে টাকা তোলাই নয়, দক্ষিণ কলকাতা ল কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিয়েও মনোজিতের নামে দুর্নীতির অভিযোগ আছে। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে কলেজ ও অন্য সূত্র থেকে বিপুল টাকা উঠলেও তার কোনও হিসেব কলেজের কাছে নেই, পুরোটাই মনোজিৎ ও তার দলবলের মুঠোয়।

বোধহয় এ হেন টাকা লুটের সর্দারকে যোগ্য সম্মান দিতে এবং লুটের কারবার যাতে অবাধে ও স্থায়ী ভাবে চলতে পারে, সে জন্য ওই কলেজেই মনোজিৎকে চুক্তিভিত্তিক চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তৃণমূল কর্তারা। অথচ কালীঘাটের বাসিন্দা মনোজিতের নামে সেই ২০১৩ সাল থেকেই পুলিশের কাছে অভিযোগের পর অভিযোগ দায়ের হয়ে এসেছে। কখনও কারও বুকে ছুরির কোপ বসানো, কখনও কলেজে ভাঙচুর, এমনকি সাম্প্রতিক ঘটনাটির মতোই, ২০২২ সালে ওই কলেজেই প্রথম বর্ষের এক ছাত্রীকে যৌন নিগ্রহের অভিযোগে এফআইআর হয়েছে মনোজিতের নামে। এ ছাড়াও তার বিরুদ্ধে টাকা হাতানো, হুমকি, নিগ্রহ, র‍্যাগিংয়ের মতো আরও অসংখ্য অভিযোগ আছে। যদিও এতকিছু সত্ত্বেও এতদিন পর্যন্ত পুলিশ মনোজিতের বিষয়ে চোখ বন্ধ করেই ছিল এবং তা যে শাসক দলের নেতাদের নির্দেশেই, তা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। সমাজমাধ্যমে প্রকাশিত নানা পোস্ট থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের তাবড় নেতাদের সঙ্গে মনোজিতের ঘনিষ্ঠতার যে ছবি বেরিয়ে এসেছে, সম্ভবত তারই জোরে, শুধু ওই কলেজের ছাত্রছাত্রীদের উপরেই নয়, কলেজ পরিচালন সমিতি, এমনকি স্বয়ং অধ্যক্ষের উপরেও তার হুকুম চলত। অধ্যাপকদের ক্লাসের রুটিনও নাকি ঠিক হত তার কথাতেই।

নেতাদের প্রশ্রয়ে এ হেন দাদাগিরির সুযোগ নিয়ে মনোজিতের মতো একজন দুষ্কৃতী যে যা-খুশি করার স্পর্ধা দেখাবে— সেটাই স্বাভাবিক। তাই কলেজে ফাঁকা পড়ে থাকা গার্ডরুমে নিজের বিলাসকক্ষ সাজিয়ে নিয়ে প্রায়ই সেখানে মদ্যপান সহ বেলাগাম হৈ-হুল্লোড়ের আসর বসাত মনোজিৎ। অধ্যক্ষের কাছে নাকি খবর ছিল না! বোঝা কঠিন নয়, খবর থাকলেও উপরমহলের চাপে তাঁর বিশেষ কিছু করার ছিল না।

প্রশ্ন উঠেছে, এই নৃশংস ঘটনার সম্পূর্ণ দায় কি একা মনোজিৎ ও তার সাঙ্গপাঙ্গদেরই! শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের যে দুর্নীতিগ্রস্ত নেতারা এতদিন ধরে লুটের বখরায় খুশি হয়ে মনোজিতদের মতো জঘন্য দুষ্কৃতীদের পিঠ চাপড়ে এলেন, গ্রেফতারি ও বিচারের হাত থেকে তাদের আড়াল করে গেলেন, এই ধর্ষণের দায় তাঁদের উপরেও বর্তাবে না কেন? যে মানুষগুলির ভোটে জিতে তাঁরা মন্ত্রী-বিধায়ক হয়েছেন, তাঁদেরই একজনের পরিবার থেকে কলেজে পড়তে আসা কন্যাটিকে আজ চরম নির্যাতিত হতে হল ওই নেতাদের দলেরই কুখ্যাত দুষ্কৃতীর হাতে!

শাসক দলের প্রশ্রয়ে দুষ্কৃতীদের বাড়বাড়ন্তের ঘটনা তৃণমূল শাসনেই প্রথম, এমন নয়। আগের সিপিএম-ফ্রন্ট সরকার এ বিষয়ে অসাধারণ সব উদাহরণ রেখে গেছে। বাস্তবে পুলিশ ও প্রশাসনকে দলদাসে পরিণত করা এবং শাসক দলের নানা স্তরের নেতা ও অনুগামী দুর্বৃত্তদের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে এমনকি পাড়ায় পাড়ায় প্রতিটি পরিবারের উপর প্রবল দাপট প্রদর্শন ও দাদাগিরিতে অতিষ্ঠ হয়েই রাজ্যের মানুষ সিপিএম সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরিয়েছিল। রাজ্যের সরকারে বসে তৃণমূল কংগ্রেস তা থেকে শিক্ষা নেওয়া দূরস্থান, পূর্বসূরীর দেখিয়ে যাওয়া পথেই হাঁটতে শুরু করে। আজ সর্বস্তরে তাদের নেতাদের দুর্নীতি, দাপটের রাজনীতি ও দুষ্কৃতী-নির্ভরতা চরম মাত্রায় পৌঁছেছে। এই অবস্থায় অভিযোগ দায়েরের পরে পরেই দক্ষিণ কলকাতা ল কলেজের ঘটনায় জড়িত দুষ্কৃতীরা যে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছে, তা আশার কথা। কিন্তু রাজ্যের মানুষ জানেন, শুধু এই গ্রেফতারি অপরাধীদের শাস্তির নিশ্চয়তা দেয় না। আসল খেলা শুরু হয় এর পরে। আর জি করের ঘটনা তার উজ্জ্বল উদাহরণ। ইতিমধ্যেই পুলিশ নির্যাতিতার বয়ান বলে যা জমা দিয়েছে, সেখানে পুরো নামের বদলে অভিযুক্তদের যে সাঙ্কেতিক নামে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সেগুলিকেও অদল-বদল করা হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেছে। প্রশ্ন উঠেছে, তা হলে উপরমহলের নির্দেশে এরই মধ্যে কি প্রভাবশালী মনোজিৎ মিশ্রকে বাঁচানোর প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে পুলিশ!

রাজ্যের প্রতিবাদী মানুষের তাই আজ সতর্ক

পাঁচের পাতায় দেখুন

এ রথ ভোটের

একের পাতার পর

দলও জোড়হস্তে জগন্নাথ বন্দনায় নেমে পড়েছেন। জানা যাচ্ছে রাজ্যের খোদ পুলিশ প্রধান মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছায় সারা রাত জেগে রথ চালানোর মহড়া দিয়েছেন, যাতে আসল সময়ে কোনও ব্যাঘাত না ঘটে। যদিও তাঁর এই নিষ্ঠা দুষ্কৃতীদের ধরার সময়ে কোথায় মুখ লুকোয় জানতে চাওয়া বৃথা। যেমন জানতে চাওয়া শুধু এ রাজ্যে কেন এ দেশেই আজ বৃথা— সরকারি আমলা-পুলিশ অফিসার হিসাবে কেন কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজনে এই আধিকাররিকরা হাত লাগাবেন? মুখ্যমন্ত্রীর তাড়া অনেক, পরের বছর রথের আগেই যদি বিধানসভা নির্বাচনটা হয়ে যায়! তাই হিন্দুত্বের রক্ষাকর্তা সাজার দৌড়ে বিজেপির থেকে এগিয়ে থাকতে গেলে নীতি, সাংবিধানিক রীতি, নিয়ম কোনও কিছু মনে রাখলে এখন তাঁর চলবে না। আর বিজেপিও পড়ে আছে কার রথ বড় হল—মুখ্যমন্ত্রী না বিরোধী দলনেতা, কে বেশি নারকেল ফাটাতে পেরেছেন, এই নিয়ে। শাসক-বিরোধী উভয় পক্ষের রাজনীতির ভাষ্য দিনে দিনে রাজনৈতিক বিষয় ছেড়ে পাড়ার কলতলার কোন্দলের আকার নিচ্ছে।

বিধানসভার ভোট কাছে আসা মাত্রই তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির এই ভক্তির প্রতিযোগিতা দেখিয়ে দিচ্ছে, এদের কারও জনগণের সামনে দাঁড়িয়ে জনস্বার্থে কিছুই বলবার নেই। কে বড় হিন্দু সেই বিচার করার জন্যই কি মানুষ এমএলএ-এমপি নির্বাচিত করেন? এটাই কি লোকসভা-বিধানসভার কাজ? এই জন্যই কি জনগণ ট্যাক্স জোগায় সরকারকে? তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, বছরের পর বছর স্কুল-কলেজ থেকে শুরু করে সরকারি অফিস, কোথাও চাকরি না হওয়ার ক্ষোভে রাজ্যের মানুষ ফুঁসছে। বিদ্যুৎ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যর মতো গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত ক্ষেত্রে সরকারি অপদার্থতা চরমে। এ দিকে আর জি করের ধর্ষণ-খুনের বিচার হল না। দক্ষিণ কলকাতা ল কলেজের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে কলেজের ভিতরে ধর্ষিতা হলেন ছাত্রী। কালীগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনে জেতার আনন্দে বোমাবাজি করে কিশোরীর প্রাণ কেড়ে নিল তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা। রাজ্যে দুর্নীতি এবং সমাজবিরোধী কার্যকলাপের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতী এবং তাদের রক্ষাকর্তা হিসাবে নেতা-মন্ত্রী-আমলা-পুলিশ অফিসারদের নাম একেবারে খচিত হয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে শুধু লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, যুবশ্রীতে আস্থা রাখতে না পেরে একটিই রাস্তা তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী খুঁজে নিয়েছেন— প্রবল হিন্দুত্বের জোয়ার তোলার রাস্তা। মুর্শিদাবাদের ঘটনায় ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির আশ্রয় খুঁজতে গিয়ে তাঁরা দুষ্কৃতী তাণ্ডব চলতে দিয়েছিলেন। ফলে বিজেপি তাঁদের গায়ে মুসলিম তোষণের যে তকমা লাগাতে পেরেছে তা ঝেড়ে ফেলতে এই ওষুধেই ভরসা রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

অন্য দিকে বিজেপি ভোট রাজনীতিতে তৃণমূলের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার লক্ষ্যে এই রাস্তার বাইরে আর কিছু খুঁজে পায়নি। মানুষের সামনে জনস্বার্থ সম্পর্কিত কোনও কিছু বলবার মতো মুখ তাদেরও নেই। গোটা দেশ আজ বিজেপি শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছে। সারা দেশেই তাদেরও ভোট রাজনীতির হাতিয়ার মন্দির-মসজিদ বিতর্ক, সাম্প্রদায়িক বিভেদ আর ধর্মীয় মেরুকরণ। পশ্চিমবঙ্গে আলাদা কোনও অবস্থান তাদের নেই। পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি নেতারা যে ভাষায় চরম সাম্প্রদায়িক প্রচার করে যাচ্ছেন তা এ রাজ্যের মানুষ আগে কোনও দিন চিন্তাও করেনি। সম্প্রতি ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে গিয়ে বিপ্লবী কবি কাজি নজরুল ইসলামের নাম করে কটূক্তি করতেও তাঁদের আটকায়নি। কালীগঞ্জের বিধানসভা উপনির্বাচনে হারার পর বিজেপি নেতারা 'হিন্দু ভোট' এবং 'মুসলিম ভোটে'র চুলচেরা বিশ্লেষণে বসেছিলেন। যদিও হিন্দু ভোটার সংখ্যাগরিষ্ঠ এমন বুথেও ফল তাঁদের পক্ষে হতাশাজনকই। তবু এই মারাত্মক বিভাজনের রাজনীতির বিষময় ফলে আজ গোটা সমাজ জর্জরিত হচ্ছে। ভোটের স্বার্থে নানা কল্পিত কাহিনি ছড়িয়ে দিয়ে মুসলিম বিদ্বেষের জোয়ার তুলে হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক সংহত করে তাঁরা ২০২৬-এ বিধানসভা দখলের স্বপ্ন দেখছেন। তাঁদের এক নেতা বলেই দিয়েছেন, সরকার গঠন করতে পারলে চ্যাঙদোলা করে সব মুসলিম বিধায়ককে তাঁরা বিধানসভার বাইরে ফেলে দেবেন। দেশে যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষ পরিবেশ না থাকায় এই সাম্প্রদায়িক প্রচারের বিষে কিছু মানুষ আচ্ছন্নও হচ্ছেন। এই কার্যক্রম চলতে থাকলে আজ হিন্দু-মুসলমান হবে, কাল হয়ত হবে খ্রিস্টান-হিন্দু, পরশু হতে পারে জনজাতি আর অন্যদের লড়াই। এর শেষ কোথায়? বাস্তবে খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের কোন উপকার এতে হবে? বিজেপি দেখেছে এই বাংলার মাটিতে আজও রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল, চিত্তরঞ্জন দাশ, নেতাজি সুভাষচন্দ্রের মতো মনীষীদের চিন্তার প্রভাব কাজ করে যাওয়ায় তাদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি পুরোপুরি জায়গা নিতে পারছে না।

স্বাধীন ভারতে এই বাংলায় ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলন, ট্রাম-বাস ভাড়া বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনে শুধু নয়, একেবারে সাম্প্রতিক কালে চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের আন্দোলন, আর জি কর আন্দোলনেও হিন্দু-মুসলিম, উঁচুজাত-নিচুজাত, জনজাতি, আদিবাসী ইত্যাদি সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছেন, লড়ে চলেছেন। লড়াইয়ের ময়দানে তাঁদের মনে সাম্প্রদায়িক বিভেদ কোনও সময় উদয়ও হয়নি। ফলে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে যাঁরা মানুষকে ভাগ করতে চাইছেন তাঁরা আসলে মানুষের সর্বনাশ চাইছেন। তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে করতে যাতে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের জনবিরোধী ভূমিকার দিকে মানুষের চোখ না পড়ে সে জন্যই বিজেপি ভোট মেরুকরণের আড়ালে সাম্প্রদায়িক বিভেদকে বড় করে তুলতে চাইছে। সেই কারণেই বিজেপি আর জি কর আন্দোলন, শিক্ষকদের আন্দোলন থেকে দূরে থেকেছে।

দুঃখের হলেও সত্য এ রাজ্যে বামপন্থী পরিচিতি নিয়ে সিপিএম সরকার চালানোর পরেও দেখা যাচ্ছে তাদের দলের বহু কর্মী-সমর্থকও এই মানসিকতায় আচ্ছন্ন। দীর্ঘ সময় পেয়েও বামপন্থার আদর্শকে কর্মী-সমর্থকদের জীবনবোধে পরিণত করতে তাঁরা চাননি। পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি এবং সুবিধাবাদে আচ্ছন্ন রেখে গদি বাঁচাতে চেয়েছেন মাত্র। তার ফল আজ দিতে হচ্ছে। এমনকি ভোটের স্বার্থে সিপিএম নির্বাচনে রাজ্যের বুকে 'আগে রাম পরে বাম' স্লোগান তুলে বিজেপিকে সাহায্য করে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়েছে। একই সাথে কংগ্রেসের মতো দল, যাদের ধর্মনিরপেক্ষ অবস্থানের ভিত কোনও দিনই পোক্ত নয়, তাদের সাথে ঐক্য করে বামপন্থার ক্ষতি করেছে। ভুলে যাওয়া চলে না, এই কংগ্রেসই বাবরি মসজিদের তালা খুলে বিজেপির মন্দির রাজনীতির সুবিধা করে দিয়েছে। তাদের নেতা রাহুল গান্ধী কিছুদিন আগেও ভোট জোগাড়ে শিবভক্ত সেজেছেন। এই শক্তিকে সাথে নিয়ে বিজেপি-আরএসএস-এর মতো সংগঠিত সাম্প্রদায়িক শক্তিকে কি মোকাবিলা করা সম্ভব? তা যে নয় তা আজ প্রমাণ হচ্ছে বারবার।

মুখ্যমন্ত্রী এবং বিজেপি নেতাদের রথযাত্রার অসুস্থ প্রতিযোগিতার নিন্দা অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু আর একটা ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির দৃষ্টিতে তা করলে হবে না। এর মোকাবিলা করতে গণতান্ত্রিক বোধসম্পন্ন মানুষের ঐক্য এবং সংগ্রামী বামপন্থার রাস্তায় গণআন্দোলনই একমাত্র ভরসা।

পার্টিকে হতে হবে শ্রমিক শ্রেণির অগ্রগামী বাহিনী

জে ভি স্ট্যালিন

"সবচেয়ে প্রথমে, পার্টিকে হতে হবে শ্রমিক শ্রেণির অগ্রগামী বাহিনী। পার্টিকে অবশ্যই শ্রমিক শ্রেণির সর্বোত্তম অংশকে, তাঁদের অভিজ্ঞতাকে, তাদের বিপ্লবী তেজ ও সর্বহারা শ্রেণির প্রতি তাঁদের নিঃস্বার্থ নিষ্ঠাকে পুরোপুরি আত্মস্থ করতে হবে। কিন্তু সত্যি সত্যি অগ্রগামী বাহিনী হতে হলে পার্টিকে বিপ্লবী তত্ত্ব, আন্দোলন ও বিপ্লবের নিয়ম সংক্রান্ত জ্ঞানে বলিয়ান হতে হবে। এ ছাড়া পার্টি সর্বহারার সংগ্রামকে পরিচালনা করতে, তাকে নেতৃত্ব দিতে পারবে না। শ্রমিক শ্রেণি কী অনুভব করে, কী চিন্তা করে তা প্রতিফলিত করার মধ্যেই যদি পার্টি নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে, যদি পার্টি স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের লেজুড়বৃত্তি করে, যদি স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের জড়তা ও রাজনৈতিক ঔদাসীন্যকে সে অতিক্রম করতে না পারে, যদি সে সর্বহারার আশু স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠতে না পারে, যদি সর্বহারা শ্রেণি স্বার্থের উপলব্ধির স্তরে সে জনগণকে তুলতে না পারে তবে পার্টি যথার্থ পার্টি হতে পারবে না। পার্টিকে শ্রমিক শ্রেণির পুরোভাগে থাকতেই হবে। শ্রমিক শ্রেণির চাইতে তাকে আরও অনেক দূর দেখতে হবে। তাকে সর্বহারা শ্রেণিকে নেতৃত্ব দিতে হবে এবং তার স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের লেজুড়বৃত্তি করা চলবে না। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের যে সব পার্টি লেজুড়বৃত্তি করত তারা ছিল বুর্জোয়া মতবাদের ধারকবাহক। এরা সর্বহারা শ্রেণিকে বুর্জোয়াদের ক্রীড়নকে পরিণত করেছিল। যে পার্টি শ্রমিক শ্রেণির অগ্রগামী বাহিনীর ভূমিকা পালন করে ও সর্বহারার শ্রেণিস্বার্থের উপলব্ধির স্তরে জনগণকে তুলতে পারে— একমাত্র সেই ধরনের পার্টিই পারে শ্রমিক শ্রেণিকে ট্রেড ইউনিয়নবাদের পথ থেকে সরিয়ে আনতে ও তাকে পরিণত করতে পারে একটা স্বাধীন রাজনৈতিক শক্তিতে।"

— ক্রেমলিনে লেনিন স্মৃতিসভায় প্রদত্ত ভাষণ
২৮ জানুয়ারি ১৯২৪

ইরানে মার্কিন-ইজরায়েল হামলা
যে প্রশ্নগুলি তুলে দিল

ইরান ও ইজরায়েল-মার্কিন জোটের যুদ্ধে বিরতি ঘোষিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত দু-পক্ষই তাতে সম্মত হয়েছে। কিন্তু তাতে সত্যিই কি যুদ্ধ শেষ হল? নাকি আপাতত ধামাচাপা দেওয়া থাকল ভবিষ্যতে আরও কোনও যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য?

যুদ্ধে কি কেউ জেতে?

যুদ্ধে জড়ানো তিনটি দেশই এই যুদ্ধে নিজেদের জয়ী বলে প্রচার করছে। ইজরায়েলের দাবি তারা ইরানের পরমাণু কর্মসূচিকে কয়েক বছর পিছিয়ে দিতে পেরেছে। এ নাকি তাদের এক 'ঐতিহাসিক বিজয়'। যুদ্ধে ইরান বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। তার পরমাণু কেন্দ্রগুলির ক্ষতি হয়েছে। মারণাস্ত্রের আঘাতে শীর্ষ পরমাণু বিজ্ঞানীদের এবং সেনাবাহিনীর শীর্ষকর্তাদের মৃত্যু হয়েছে এবং তার মিসাইল প্রতিরোধী ব্যবস্থাটি ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়েছে। ছশোর বেশি নাগরিকের মৃত্যু এবং কয়েক হাজার মানুষ আহত হয়েছে। যদিও যুদ্ধে জয় বা পরাজয় শুধু বস্তুগত ক্ষতি দিয়ে নির্ধারণ করা যায় না। এত ক্ষতি সত্ত্বেও ইরান আত্মসমর্পণে রাজি হয়নি। উল্টো দিকে, ইরানের মিসাইল আক্রমণ ইজরায়েলের বহুখ্যাত প্রতিরোধী ব্যবস্থার 'অপ্রতিরোধ্য' মিথকে ভেঙে দিতে এবং গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতে যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু, যিনি ইরানে শাসক বদলের লক্ষ্য ঘোষণা করে দিয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত যুদ্ধবিরতি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। আর, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যিনি ইরানের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ চেয়েছিলেন, কাতারে মার্কিন ঘাঁটিতে ইরানের মিসাইল হামলার পর বাধ্য হয়েছেন যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করতে।

এই যুদ্ধ ইজরায়েলের মার্কিন-নির্ভরতা প্রকট করে দিয়েছে। বাস্তবে যুদ্ধে মার্কিন অংশগ্রহণ ইজরায়েলকে ইরানি প্রতিরোধের সামনে থেকে বেরিয়ে আসারই রাস্তা করে দিয়েছে। ইরাক, লিবিয়া, আফগানিস্তানের অভিজ্ঞতা থেকে আমেরিকার জনগণ আর একটি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে জড়ানো থেকে সরকারকে বিরত হওয়ার জন্য দাবি তুলেছে, যা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মতো স্বৈরাচারীও অমান্য করতে পারেননি। নির্বাচনের আগে ট্রাম্পের দেওয়া দেশের বাইরে যুদ্ধে না জড়ানোর প্রতিশ্রুতি মনে করিয়ে দিয়ে আমেরিকা জুড়ে প্রবল গণবিক্ষোভ শুরু হয়েছে। বিরোধী ডেমোক্র্যাট, এমনকি নিজের দল কনজারভেটিভদের মধ্যেও ট্রাম্পের ইরান আক্রমণের তীব্র বিরোধিতা উঠেছে। ইজরায়েলের অভ্যন্তরে প্যালেস্টাইন এবং ইরানে যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ চলছে। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি ইজরায়েল-আমেরিকা— কারও পক্ষেই যুদ্ধের খুব অনুকূলে ছিল না।

আমেরিকাই ইরানকে পরমাণু অস্ত্র তৈরির দিকে ঠেলে দিল

যুদ্ধের পর ইরান পরমাণু অস্ত্র অ-সম্প্রসারণ চুক্তি (এনপিটি) থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং সে দেশের পার্লামেন্ট সেই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছে। ইরান জানিয়ে দিয়েছে, তারা শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে পারমাণবিক শক্তি উন্নয়নের কাজ চালিয়ে যাবে। এ ব্যাপারে তারা আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা (আইএইএ)-র সঙ্গে আর কোনও রকম সহযোগিতা করবে না। ইরানের এই সিদ্ধান্তকে অজুহাত করেই হয়তো ভবিষ্যতে আবার ইজরায়েল এবং আমেরিকা ইরানকে আক্রমণ করে বসবে।

যুদ্ধ বহু প্রশ্নকে সামনে এনে দিল

ইজরায়েলের ইরান আক্রমণের ঘটনা এবং ইরানের পাল্টা প্রতিরোধ আক্রমণ এবং তাতে আমেরিকার জড়িয়ে পড়ার ঘটনা অনেকগুলি প্রশ্নকে সামনে এনে দিয়েছে, যেগুলি বিচার করে দেখা দরকার।

যে বিষয়টিকে সামনে রেখে ইজরায়েল ইরানের উপর হামলা শুরু করেছিল যে, ইরান পরমাণু অস্ত্র বানাচ্ছে, সেটা কি নিশ্চিত ছিল? আইএইএ-র রিপোর্টে ইরানের পরমাণু অস্ত্র তৈরির কথা বলা হয়নি। আমেরিকার জাতীয় গোয়েন্দা বিভাগের অধিকর্তা তুলসী গ্যাবার্ডও গত মার্চেই স্পষ্ট বলেছিলেন, ইরান পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করছে না। তা হলে কীসের ভিত্তিতে ইজরায়েল এবং আমেরিকা ইরানে হামলা চালাল?

এর আগে কি কোনও দেশ পরমাণু অস্ত্র তৈরি করেনি? বিশ্বের বহু দেশই তো শত শত পরমাণু বোমার মালিক। ইজরায়েল নিজেই যে পরমাণু শক্তিধর দেশ তা কারও অজানা নয়। শুধু তাই নয়, ইরান শুরু থেকে পারমাণবিক অ-সম্প্রসারণ চুক্তির (এনপিটি) সদস্য। ইজরায়েল সেই চুক্তিতে অংশই নেয়নি এবং আইএইএ বা অন্য কোনও আন্তর্জাতিক নজরদারিতে রাজি হয়নি। আমেরিকা বৃহৎ পারমাণবিক শক্তির অধিকারী এবং বিশ্বে একমাত্র পারমাণবিক হামলার নায়ক সে নিজে। ইরান, এখনও পর্যন্ত যার পরমাণু অস্ত্র তৈরির প্রমাণ নেই, তা হলে সে দেশটির মানুষ কিংবা সেখানকার নেতারা পরমাণু অস্ত্রের অধিকারী দেশগুলির থেকে বেশি বিপজ্জনক হয়ে উঠল কী করে? এর থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যে-কোনও অভিযোগ তুলে ইরানের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাকে নতিস্বীকার করানোটাই এই পরিকল্পনার মূলে। ঠিক এই জিনিসই বিশ্বের মানুষ দেখেছিল ইরাক, লিবিয়া এবং আফগানিস্তানের ক্ষেত্রে। আসলে পশ্চিম এশিয়ায় আমেরিকার একমাত্র প্রতিরোধী শক্তি হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে ইরান। ইরানকে নতিস্বীকার করাতে পারলে তেল-সমৃদ্ধ সমগ্র এলাকাটি আমেরিকার দখলে আসবে, ইরানের কর্তৃত্বে থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালী আমেরিকার নিয়ন্ত্রণে আসবে এবং এই অঞ্চলে রাশিয়া-চিনের প্রভাবও আটকানো যাবে— যা আমেরিকা এবং পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির প্রভাবকে এই অঞ্চলে নিশ্চিত করবে।

বাস্তবিক ইজরায়েল এবং আমেরিকার এই স্বৈরতান্ত্রিক কার্যকলাপই ইরানকে এনপিটি থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য করল। তাদের পরমাণু কার্যক্রমে আর কোনও নজরদারিই থাকবে না। ফলে ইরান যদি এ বার আত্মরক্ষার অধিকারের কথা বলে গোপনে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির কথা ভাবে, তবে তা তৈরির রাস্তা তার কাছে আরও সহজ হয়ে গেল। আর তা যদি সত্যিই ঘটে তবে ইজরায়েল এবং আমেরিকাই তার জন্য দায়ী থাকবে।

ইজরায়েল বলেছে, ইরানের পরমাণু শক্তি তাদের অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক। তাই তারা তা রোধ করতে ইরানের উপর হামলা চালিয়েছে। কিন্তু ইরান পরমাণু শক্তি অর্জন না করা সত্ত্বেও পরমাণু শক্তিধর ইজরায়েল যে ভাবে তার উপর আক্রমণ চালাল তাতে কি ইজরায়েলই ইরানের পক্ষে বেশি বিপজ্জনক বলে প্রমাণ হল না? প্যালেস্টাইন, লেবানন, সিরিয়া জুড়ে ইজরায়েলের কার্যকলাপ ইতিমধ্যেই এই এলাকার জনগণের কাছে ইজরায়েলকে বিপজ্জনক শক্তি বলে প্রমাণ করেছে।

আন্তর্জাতিক সমস্ত রীতি এবং আইনকে লঙ্ঘন করল আমেরিকা

অন্য দিকে ইরানের পরমাণু পরিকল্পনা আটকানোর নামে আমেরিকা যা করল, তা গায়ের জোরে আন্তর্জাতিক আইন, সিদ্ধান্ত এবং রীতিনীতিকে দু-পায়ে মাড়ানো ছাড়া আর কিছু নয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইরানের তিনটি পরমাণু কেন্দ্রকে নির্মূল করে দেওয়ার কথা বিশ্বের সামনে সগর্বে ঘোষণা করেছেন। অথচ যারা আইএইএ-র বেঁধে দেওয়া নিয়মের থেকে ইরানের এতটুকু বিচ্যুতি হয়েছে কি হয়নি তাই নিয়ে হইচই বাধিয়ে দিয়েছিল তারা কেউ পরমাণু কেন্দ্রে আমেরিকার এই হামলা নিয়ে টুঁ-শব্দটিও করল না। এতে কি সেই সব দেশগুলির রাজনৈতিক দ্বিচারিতা স্পষ্ট হয়ে গেল না? অথচ আমেরিকার এই আক্রমণ রাষ্ট্রপুঞ্জের রেজলিউশন এবং এনপিটিকেও চূড়ান্ত ভাবে লঙ্ঘন করল। খোদ আইএইএ পর্যন্ত আমেরিকার এই মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ কাজের কোনও প্রতিবাদ করল না। অথচ সত্যিই যদি পরমাণু কেন্দ্রগুলি এই আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হত তবে তা কি পরমাণু বোমা বর্ষণের থেকে কম মারাত্মক হত? তার মারাত্মক ক্ষতিকর তেজস্ক্রিয় বিকিরণে কি কেবল ইরানের নাগরিকরাই ক্ষতির শিকার হত? বাস্তবে প্রতিবেশী বহু দেশই এই মারাত্মক বিকিরণের শিকার হত।

ইউরোপের দেশগুলির শাসকদের লজ্জাজনক ভূমিকা

সবচেয়ে বড় কথা, আন্তর্জাতিক আইনের

ছয়ের পাতায় দেখুন

কালীগঞ্জে নাবালিকাকে খুনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

কালীগঞ্জের উপনির্বাচনের ফল প্রকাশের দিন তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয় মিছিল থেকে ছোঁড়া বোমার আঘাতে ৯ বছরের বালিকার মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। এই বর্বরতাকে ধিক্কার জানিয়ে এবং সমস্ত অপরাধীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ২৪ জুন এআইডিএসও এবং এআইডিওয়াইও-র পক্ষ থেকে নদিয়ায় পলাশি রেল গেট থেকে পলাশি থানা পর্যন্ত একটি বিক্ষোভ মিছিল হয়। পলাশি জাতীয় সড়ক মোড়ে বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন যুব সংগঠনের রাজ্য সভাপতি অঞ্জন মুখার্জী, ছাত্র সংগঠনের জেলা সম্পাদক সাইদুল ইসলাম, যুব সংগঠনের জেলা সম্পাদক সেলিম মল্লিক সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

এআইডিওয়াইও-র প্রতিষ্ঠা দিবস পালন

যুব সংগঠন এআইডিওয়াইও-র ৬০তম প্রতিষ্ঠা দিবস ২৬ জুন পালিত হল দেশের ২৪টি রাজ্যে। কলকাতায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় অফিসে সংগঠনের রক্তপতাকা উত্তোলন করেন সর্বভারতীয় সভাপতি নিরঞ্জন নস্কর। শহিদ বেদিতে মাল্যদান করেন কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃবৃন্দ। সংগঠনের উপর রচিত সঙ্গীত পরিবেশন করেন এআইডিওয়াইও-র সঙ্গীত গোষ্ঠী। ৬০তম বর্ষের লোগো উদ্বোধন হয়। নিরঞ্জন নস্কর বলেন, ১৯৬৬ সালে গুটিকয়েক যুবককে নিয়ে এই বাংলা থেকেই এআইডিওয়াইও-র যাত্রা শুরু হয়েছিল। আজ দেশের ২৪টি রাজ্যে সংগঠনের নেতৃত্বে বিভিন্ন দাবি নিয়ে যুব আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে। বহু রাজ্যে সরকার দাবি মানতে বাধ্য হচ্ছে। বক্তব্য রাখেন রাজ্য সভাপতি অঞ্জন মুখার্জী, রাজ্য সম্পাদক মলয় পাল প্রমুখ। কেন্দ্রীয় অফিস ছাড়াও রাজ্যে শতাধিক স্থানে গুরুত্ব সহকারে প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। সমগ্র কর্মসূচিটি পরিচালনা করেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় বিশ্বাস।

রাস্তা সংস্কারের দাবি মথুরাপুরে

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় এস ইউ সি আই (সি) মথুরাপুর-১ ব্লক কমিটির উদ্যোগে ২৪ জুন বেহাল রাস্তা সংস্কার, পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ, মদের লাইসেন্স বন্ধ, নারী নির্যাতন রুখতে মথুরাপুর-১ বিডিওতে বিক্ষোভ দেখানো হয়। কমরেড নাসির মীরের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল বিডিও-র কাছে স্মারকলিপি দেয়। বিডিও দাবিগুলির সাথে সহমত পোষণ করে দ্রুত সেগুলি কার্যকর করার আশ্বাস দেন। বিক্ষোভ সভায় নেতৃত্ব দেন কমরেডস শ্যামল প্রামাণিক, বিশ্বনাথ সরদার, নাজিরা খাতুন সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

ওয়াটার ক্যারিয়ার ও সুইপার কর্মচারীদের বিক্ষোভ

রাজ্য সরকারের অধীনে বিভিন্ন অফিসে কর্মরত প্রায় ২০ হাজার ওয়াটার ক্যারিয়ার ও সুইপার কর্মচারী বহু বছর ধরে সামান্য বেতনে গ্রুপ-ডি কর্মচারীর মতো সমস্ত কাজ করে আসছেন। ২০২৩ থেকে বারবার প্রশাসনিক নানা স্তর থেকে এই কর্মচারীদের গ্রুপ-ডি পদে নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও কিছুই করা হয়নি।

এই বঞ্চনার প্রতিবাদে ২৪ জুন হাওড়া ডিএলআরও অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। নেতৃত্ব দেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সমরেন্দ্রনাথ মাজী, ওয়াটার ক্যারিয়ার সুইপার (কর্মবন্ধু) সমন্বয় সমিতির রাজ্য সভাপতি নিখিল বেরা ও ইউনিয়নের জেলা সম্পাদক শ্যামল মাইতি। তাদের দাবি, অন্যান্য কর্মীদের মতো অবসরকালীন অনুদান ৫ লক্ষ টাকা দিতে হবে, সমস্ত জেলাতে স্যাট-এর আদেশনামা অনুযায়ী ১৯৯৯ সাল থেকে সমস্ত বকেয়া প্রদান করতে হবে, সমস্ত ওয়াটার ক্যারিয়ার ও সুইপার (কর্মবন্ধু)-দের বোনাস দিতে হবে, মৃত বা শারীরিকভাবে অক্ষম কর্মীর পোষ্যদের নিয়োগের সংস্থান করতে হবে, কাজে সক্ষম থাকা অবস্থায় অবসর দেওয়া চলবে না। মিছিল থেকে ৯ জুলাইয়ের ধর্মঘট সফল করার আহ্বান জানানো হয়।

ভোট মানেই কি বোমা আর খুন

ভোট মানেই নাগরিকের প্রাণহানি যেন একটা সাধারণ বাস্তবে পরিণত হয়েছে। তাই নেহাত সাধারণ একটা উপনির্বাচনও জড়িয়ে গেল নিরপরাধ এক স্কুল-বালিকার মৃত্যুর সঙ্গে।

নদিয়ার কালীগঞ্জে ২৩ জুন উপনির্বাচনের ফল ঘোষণার আগেই জয় নিশ্চিত জেনে তৃণমূল কংগ্রেসের উল্লাস-মিছিল থেকে ছোঁড়া একটি সকেট বোমা ১০ বছরের বালিকা তমান্না খাতুনের বুকে এসে লাগে। ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়। অভিযোগ— তমান্নার পরিবার ও তাদের প্রতিবেশীরা তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থক না হওয়ায় এই হামলা এবং এমন যে হবে, আগে থেকেই নাকি সেই হুমকি দিয়ে রেখেছিল শাসক দলের স্থানীয় নেতারা। দলদাস পুলিশ যথারীতি তা রোখার কোনও ব্যবস্থা নেয়নি।

ভোট রাজনীতি আজ দুষ্কৃতীনির্ভর হয়ে পড়েছে তমান্নার মৃত্যুর ঘটনা তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। সেই নির্ভরতার মাত্রা এতটাই যে, উপনির্বাচনে দলীয় প্রার্থীর বিজয় মিছিলে হৈ-হল্লা, নির্মল আনন্দ নয়, বোমা-গুলি হাতে প্রকাশ্যে উল্লাসে মাতে দলের নেতা-কর্মীরা। যেখানে যে ক্ষমতায় সেখানেই তারা সেই সব অস্ত্রের প্রয়োগও ঘটায়— সাধারণ মানুষের প্রাণের পরোয়াটুকুও না করে। কেন এই উল্লাস? জয়ী প্রার্থীর দলের সুবিধাভোগী অংশ হিসাবে আরও এক বছর এলাকায় দাপট খাটানো, সুযোগ-সুবিধা লুঠের মওকা পাওয়া গেল বলেই তো! ফলে এ রাজ্যে তৃণমূলের পূর্বসূরী কংগ্রেস কিংবা সিপিএমের মতো আজ তৃণমূলেরও যে দাপট আর হুমকির রাজনীতিই ক্ষমতা হাতে রাখার মূল হাতিয়ার, এ ঘটনা সেটাও দেখিয়ে গেল। অন্যত্র বিজেপির ক্ষমতার সূত্রও তাই।

ভোটকে কেন্দ্র করে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলির কর্মী-সমর্থকদের পারস্পরিক খুন-জখম, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়া এ রাজ্যের পুরনো ট্র্যাডিশন। কংগ্রেস আমল থেকে শুরু হয়ে আগের সিপিএম-ফ্রন্ট সরকারের আমলে তার ব্যাপক বাড়বাড়ন্ত দেখেছে রাজ্যের মানুষ। শাসক সিপিএমের দুষ্কৃতী-নির্ভরতা, নির্বাচনের নামে গুলি-বোমার অবাধ ব্যবহার ও ছোট-বড়-মাঝারি নেতাদের বিপুল দাপটের বিরুদ্ধে জাগ্রত জনমতই এক সময় পতন ঘটিয়েছিল সেই সরকারের। ক্ষমতায় এসেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। অথচ সরকারে বসার পর জনগণের সমর্থনের উপর নির্ভর না করে ধীরে ধীরে তারা পূর্বসূরি শাসক দলটিরই পথ ধরে হাঁটতে শুরু করল। বলা বাহুল্য, আজ তা চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

তমান্নার মৃত্যুতে ব্যথিত, যন্ত্রণাবিদ্ধ সমস্ত মানুষ। এই সময়ে ভেবে দেখতে অনুরোধ করব, আজ রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নকে ছাপিয়ে রাজনীতিকেই দুর্বৃত্তের পেশা করে তোলার দিকে শাসক দলগুলো যেতে পারছে কেন। রাজনীতিতে নীতি বিসর্জনই তার কারণ। এ রাজ্যে মানুষের স্মৃতিতে আছে, কুলতলি, জয়নগরের বিস্তীর্ণ এলাকায় এসইউসিআই(সি)-র সংগঠন ভাঙতে সিপিএম-এর দুষ্কৃতী বাহিনী দশকের পর দশক ধরে যে ভয়াবহ আক্রমণ চালিয়েছে তাতে প্রাণ হারিয়েছেন দলের কিশোর কর্মী পূর্ণিমা ঘড়ুই, ভুবনেশ্বরীর জয়দেব পাইক, গোপালগঞ্জের বাঁটুল হালদার সহ তেভাগা আন্দোলনের নেতা, দলের কৃষক সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক আমিরালি হালদার সহ দেড় শতাধিক নেতা-কর্মী। সে দিন বার বার এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষ থেকে সিপিএম নেতৃত্বকে সাবধান করে বলা হয়েছিল যে, এই খুনের রাজনীতি পরবর্তী কালে জমানা বদল হলে অন্য দল তাঁদের বিরুদ্ধেও কিন্তু হাতিয়ার করবে। তাঁরা সেদিন সে কথায় কান দেননি। এরই ধারাবাহিকতায় আজ শাসক তৃণমূল কংগ্রেস সেই খুন-জখমের রাজনীতিকেই ক্ষমতা দখলের অস্ত্র বানিয়েছে। সে দিনের সিপিএম দুষ্কৃতীরা অনেকেই আজ তৃণমূলের নেতা এমনকি বিধায়ক হয়েছেন।

কালীগঞ্জ

তমান্নার মৃত্যুর ঘটনায় রাজ্য জুড়ে জনরোষের চাপে, এই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত পুলিশ নয় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে বলে জানা গেছে। জানা গেছে, অভিযুক্তরা প্রত্যেকেই এলাকায় শাসক দলের হোমরা-চোমরা এবং এদের মর্জির উপরেই ওই অঞ্চলের বাসিন্দাদের জীবনযাত্রা অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত হয়। এ হেন দাপুটে নেতাদের গ্রেফতার করা হয়েছে— নিঃসন্দেহে তা স্বস্তির খবর। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ জানে, গ্রেফতারি মানেই আজকের দিনে যথাযথ বিচার ও শাস্তির নিশ্চয়তা নয়। প্রাথমিক ভাবে গ্রেফতার হলেও শাসক দলের অভয়হস্ত মাথায় থাকায় বহু অভিযুক্তকে অচিরেই জামিনে বেরিয়ে এসে আবার স্বমহিমায় বিরাজ করতে দেখতে অভ্যস্ত রাজ্যবাসী। ফলে যথাযথ বিচারের মাধ্যমে অপরাধীদের কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে রাজ্যের, বিশেষত ওই জেলা ও অঞ্চলের সাধারণ মানুষকে সক্রিয় হতে হবে। তমান্নার খুনিদের শাস্তি চাই— এই দাবিতে একজোট হয়ে ওই অঞ্চলের দলমতনির্বিশেষে শান্তিপ্রিয় মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পথে নামতে হবে, যাতে পুলিশ-প্রশাসন দলদাসত্বের পুরনো অভ্যাস ছেড়ে যথাযথ নিরপেক্ষ ও কার্যকরী ভূমিকা নিতে বাধ্য হয়। অত্যাচারী শাসক কেবল জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের শক্তিকেই ভয় পায়। তাই সরকার ও শাসক দলের উপর আন্দোলনের চাপ বজায় রাখাটাই ন্যায়বিচার পাওয়ার একমাত্র গ্যারান্টি।

এআইডিএসও-র
কোচবিহার জেলাশাসক দপ্তর অভিযান

যোগ্য শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের সম্মানের সঙ্গে স্কুলে ফেরানো, শূন্যপদে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী নিয়োগ, পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ, রাজ্যের ৮০২৭টি সরকারি স্কুল বন্ধের ষড়যন্ত্র বাতিল, একাদশ দ্বাদশে সেমিস্টার প্রথা বাতিল, স্নাতক স্তরে চার বছরের ডিগ্রি কোর্স বাতিল এবং বাসে ছাত্র-ছাত্রীদের এক-তৃতীয়াংশ ভাড়ায় যাতায়াতের দাবিতে ২৫ জুন কোচবিহার জেলাশাসকের দপ্তর অভিযান করল এআইডিএসও।

ডি আই অফিসের সামনে তিন শতাধিক ছাত্রছাত্রীদের একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন এআইডিএসও-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড বিশ্বজিৎ রায়, ২০১৬ সালের যোগ্য শিক্ষক আন্দোলনের অন্যতম নেতা শরিফুল ইসলাম। এ ছাড়া জেলার স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমস্যা তুলে ধরেন। সভাপতিত্ব করেন জেলা সম্পাদক কমরেড আসিফ আলম। সেখান থেকে চার সদস্যের প্রতিনিধি দল ডিআই-কে স্মারকলিপি দেয়। পরে একটি সুসজ্জিত মিছিল ডিএম অফিস পৌঁছয়। নেতৃত্ব দেন রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায়, জেলা সম্পাদক আসিফ আলম এবং জেলা সভাপতি কৃষ্ণ বসাক।

পরিচারিকাদের অ্যাপে যুক্ত করার প্রতিবাদ

বাড়ির কাজের জন্য পরিচারিকা বা ডোমেস্টিক ওয়ার্কারদের চাহিদা ক্রমাগত বাড়ছে। এই চাহিদা লক্ষ করে বিভিন্ন সংস্থা অ্যাপভিত্তিক কর্মী সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চলেছে। মুম্বাইতে একটি সংস্থা চটজলদি গৃহসহায়িকার পরিষেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি অ্যাপ ব্যবস্থা চালু করেছে। অনেকটা গিগ কর্মীদের মতো এদের ব্যবহার করবে সংস্থাগুলি।

গিগ কর্মীদের কোনও আইনি সুরক্ষা নেই। কাজের বাজারের অনিশ্চিত অবস্থার জন্যই এই বিশেষ ক্ষেত্রে কর্মীর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার কারও তরফেই এই কর্মীদের পাশে দাঁড়িয়ে কোম্পানির শোষণ-বঞ্চনা থেকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য কার্যকর কোনও আইনি ব্যবস্থা নেই। ফলে তারা তীব্র বঞ্চনার শিকার।

সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতি ডোমেস্টিক ওয়ার্কারদের অ্যাপভিত্তিক ব্যবস্থায় যুক্ত করার বিরোধিতা করেছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে ২৫ জুন মহাকরণে রাজ্যের শ্রমমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দিয়ে জানানো হয় যে, অ্যাপভিত্তিক কর্মী নিয়োগ হলে পরিচারিকাদের অধিকার এবং সম্মানের কথা না ভেবে দ্রুতগতিতে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়াকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রে কাজের স্থায়িত্ব ও সামাজিক সুরক্ষা না থাকলে ঠেলে দেওয়া হবে ঝুঁকিপূর্ণ কাজের দিকে।

শ্রমিক সংগঠন এআইইউটিইউসি-র ডাকে এ দিন শ্রমমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দিয়ে জানানো হয়, অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা আইন ২০০৮-এ গৃহ পরিচারিকাদের যুক্ত করা হয়েছে। ভারতের ১০টি রাজ্য গৃহপরিচারিকাদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করেছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার এদের জন্য কোনও উদ্যোগ নেয়নি। গৃহপরিচারিকাদের জন্য ন্যূনতম মজুরি আইন-১৯৪৮ অনুযায়ী মজুরি নির্ধারণ তালিকাভুক্ত করা এবং ন্যূনতম মজুরি কার্যকর করার দাবি জানান সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস। গৃহ পরিচারিকাদের জন্য আলাদা কল্যাণ বোর্ড তৈরির আবেদন জানানো হয়।

কাজের দাবিতে যুব সম্মেলন ব্যারাকপুরে

ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলা এআইডিওয়াইও-র প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২২ জুন উত্তর ২৪ পরগণার কাঁচরাপাড়ায়, মাস্টারদা সূর্য সেন ভবনে। সমস্ত বেকার যুবকের কাজ, কাজ না দেওয়া পর্যন্ত উপযুক্ত ভাতা, চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ হওয়া কর্মীদের স্থায়ী করার দাবিতে এবং ড্রাগ সহ সমস্ত মাদক দ্রব্যের প্রসার, অশ্লীলতা এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই(সি)-র রাজ্য কমিটির সদস্য প্রদীপ চৌধুরী। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি অঞ্জন মুখার্জী ও সর্বভারতীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য চঞ্চল ঘোষ বক্তব্য রাখেন। কৃষ্ণেন্দু নন্দীকে সভাপতি, শান্তনু মিত্রকে সম্পাদক ও প্রসেনজিৎ দে কে কোষাধ্যক্ষ করে ১৫ জনের ব্যারাকপুর জেলা কাউন্সিল গঠিত হয়।

ট্রেন চলাচলে অস্বাভাবিক দেরি
কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীকে স্মারকলিপি

দক্ষিণ-পূর্ব রেলে অস্বাভাবিক দেরিতে ট্রেন চলা ও ট্রেন চলাচল সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান সহ ১৩ দফা দাবিতে ২৮ জুন সাঁতরাগাছিতে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেয় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর এক প্রতিনিধিদল। এতে ছিলেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য জৈমিনি বর্মন এবং মধুসূদন বেরা, গৌরীশঙ্কর দাস, তাপস বেরা, সুব্রত দাস প্রমুখ। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী ওই দিন পুরুলিয়া-হাওড়া (ভায়া বাঁকুড়া ও মশাগ্রাম) ট্রেনের উদ্বোধন করতে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন।

রেল বোর্ডের সময় অনুযায়ী ট্রেন চলাচল, লোকাল ট্রেনকে এক্সপ্রেস ট্রেনের তকমা দিয়ে ডবল ভাড়া আদায় বন্ধ করা, বেলদা-বালিচক-পাঁশকুড়া-তমলুক-ঝাড়গ্রাম স্টেশনে দ্রুত ফ্লাইওভার নির্মাণ, বেলদা থেকে দিঘা-চন্দ্রকোণা রোড ও আরামবাগ-পাঁশকুড়া ভায়া ঘাটাল নতুন রেললাইন নির্মাণ, মেচেদা স্টেশনে ওভারব্রিজ থেকে ওঠানামার জন্য দ্রুত এসকালেটর ও লিফট নির্মাণ, রেলের অব্যবহৃত ফাঁকা জায়গাতে হকারদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা প্রভৃতি দাবি জানানো হয়।

বনগাঁয় মোটরভ্যান চালকদের বিক্ষোভ

উত্তর ২৪ পরগণায় বনগাঁ শহরে মোটরভ্যান চালকদের উপরে মোটর ভেহিকেলস দপ্তরের হয়রানি ও ইউনিয়নের নেতৃত্বের সাথে দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে ২৪ জুন এআইইউটিইউসি অনুমোদিত সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের বনগাঁ মহকুমা কমিটির ডাকে দুই সহস্রাধিক মোটরভ্যান চালক এসডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখান। বনগাঁ টাউন হল ময়দান থেকে বিশাল মিছিল এসডিও অফিসের সামনে পৌঁছালে বিশাল পুলিশ বাহিনী মিছিল আটকায়। সেখানে অনুষ্ঠিত সভায় বিভিন্ন বক্তা বক্তব্য রাখেন। রাজ্য সম্পাদক জয়ন্ত সাহার নেতৃত্বে দশ জনের এক প্রতিনিধি দল এসডিও-র কাছে দাবিপত্র জমা দেয়। ইউনিয়নের দাবি অনুযায়ী বনগাঁ এআরটিও সহ মোটর ভেহিকেলস দপ্তরের আধিকারিকদেরও ডেপুটেশনে হাজির করানো হয়। সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা ইউনিয়নের সাথে দুর্ব্যবহারের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং পারস্পরিক আলাপ আলোচনায় সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন।

বিদ্যুৎ গ্রাহক কনভেনশন মেদিনীপুরে

কেন্দ্রীয় সরকারের স্মার্ট মিটার প্রকল্প সম্পূর্ণ বাতিল, ক্ষুদ্র শিল্পের বিপুল বর্ধিত ফিক্সড চার্জ প্রত্যাহার, অ্যাডিশনাল সিকিউরিটি বাবদ জমা থাকা টাকার সুদ সহ আইন অনুযায়ী গ্রাহকদের ফেরত দেওয়া, বর্ধিত মাশুল প্রত্যাহার প্রভৃতি দাবিতে বিদ্যুৎ গ্রাহক কনভেনশন হল ২৬ জুন, মেদিনীপুর শহরের মহারাজ লজে।

দুই শতাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহকদের উপস্থিতিতে এই কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির মেদিনীপুর শহর শাখার সভাপতি বিশিষ্ট সমাজসেবী দীপক বসু। ক্ষুদ্র শিল্প হুইপ অ্যান্ড গ্রাইন্ডিং অ্যাসোসিয়েশনের জেলা সভাপতি অর্জুন কুণ্ডু ও সম্পাদক সৌমেন সাহা, ডিস্ট্রিক্ট চেম্বার অফ কমার্সের সহ সভাপতি অমল মল্লিক, শালবনি থানা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক তারকনাথ মোদক, বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব তপন সেনগুপ্ত, ক্ষুদ্র শিল্প গ্রাহক কমিটির সম্পাদক হরপ্রসাদ জানা, সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক অশোক ঘোষ, জেলা নেত্রী ভবানী চক্রবর্তী প্রমুখ। প্রধান বক্তা ছিলেন রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস।

মেয়েরা নিরাপদ নয়

দুয়ের পাতার পর

হওয়ার সময় এসেছে। ইতিমধ্যেই শিক্ষাঙ্গনে ধর্ষণের জঘন্য ঘটনার প্রতিবাদে দলে দলে রাস্তায় নেমে সোচ্চার হয়েছেন মানুষ। প্রতিবাদের এই স্রোত থামতে দিলে চলবে না।

শুধু গ্রেফতারি নয়, শাসক দলের কর্তাদের অঙ্গুলিনির্দেশে ন্যায়বিচারের জাল কেটে অপরাধীরা যাতে কোনও মতেই বেরিয়ে আসতে না পারে, সে দিকে কড়া নজর রাখতে হবে রাজ্যের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকেই। না হলে বিপন্ন হবে প্রতিটি পরিবারের কন্যাদের নিরাপত্তা— হাসপাতাল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়— এতদিন ধরে যেগুলিকে সুরক্ষিত স্থান বলে ধরে নেওয়া হত তার যে কোনও একটিতে, যে কোনও মুহূর্তে। সর্বশক্তি প্রয়োগ করে এ সর্বনাশ রুখতেই হবে। মনে রাখতে হবে, সুস্থ রাজনীতি ছাত্র-যুবদের সুস্থ মানুষ হতে শেখায়, আর দুষ্ট রাজনীতি তাদের নীতিহীন অমানুষ করে তোলে। তৃণমূল সহ ভোটসর্বস্ব নীতিহীন শাসক দলগুলির এই ঘৃণ্য রাজনীতিকে পরাস্ত করে সুস্থ রাজনীতি যতদিন না সমাজে জায়গা নিতে পারছে, ততদিন এমন ঘটনা ঘটতেই থাকবে। তাই এমন ঘটনার প্রতিবাদের পাশাপাশি সুস্থ রাজনীতিকে শক্তিশালী করাও প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য।

পাঠকের মতামত

লুম্পেন সংস্কৃতি

সমাজমাধ্যমে দেখলাম কসবা আইন কলেজের ভিতরে ছাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনা প্রসঙ্গে দলীয় জনসভায় দাঁড়িয়ে সিপিএম-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক এবং পলিটবুরো সদস্য মাননীয় সেলিম সাহেব উপস্থিত শ্রোতাদের প্রশ্ন করছেন, তদন্তকারী পুলিশ অফিসারকে কীসের বাচ্চা বলা হবে? শ্রোতারা সোৎসাহে কদর্য গালিতে উল্লেখিত প্রাণীটির নাম করছেন। সেলিম সাহেব উৎসাহে আরও দু-বার প্রশ্নটি করেছেন এবং শ্রোতারা একই উত্তর দিয়েছেন। তাঁদের দলের প্রচারের আলোকে থাকা যুব নেত্রী, তথা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তৃণমূলের মুখপাত্রের নাম করে 'বরাহনন্দন' শব্দটির চলিত প্রয়োগে তাঁকে সম্বোধন করেছেন। এর আগে তাঁদের দল ক্ষমতায় থাকাকালীন দলের এক বর্ষীয়ান সাংসদ তদানীন্তন বিরোধী নেত্রীর উদ্দেশ্যে প্রশ্ন রেখেছিলেন তাঁর কোন 'খরিদ্দার' আন্দোলন চালাবার এত টাকা দিচ্ছে?

এ কথা ঠিক আজকের ভারতে রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের অধিকাংশের রুচি-সংস্কৃতির মান যে তলানিতে নেমেছে তাতে হয়ত এই কুকথার স্রোতে অনেকেই অবাক হবেন না। কিন্তু একটি মার্ক্সবাদী বলে দাবি করা দলের নেতাদের এই আচরণ বিশেষভাবে ব্যথা দেয় এই কারণে যে, মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের আদর্শ হচ্ছে এ যুগের সর্বোন্নত আদর্শ। উন্নত চিন্তা, উন্নত আদর্শ, উন্নত দর্শন তো উন্নত সংস্কৃতি উন্নত নৈতিকতাবোধ উন্নত আচার আচরণের ভিত্তিভূমি। 'যে কোনও বড় আদর্শের মর্মবস্তু নিহিত থাকে তার উন্নত রুচি-সংস্কৃতির মধ্যে'— মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষের এই কথাটিকে কোনও মার্ক্সবাদী অস্বীকার করতে পারেন না। মার্ক্সবাদী আদর্শে যথার্থই দীক্ষিত কেউ তীব্র ক্ষোভ এবং প্রতিবাদ ধ্বনিত করার সময়েও অশ্লীল শব্দ দূরের কথা, কোনও নিম্নরুচির শব্দও প্রয়োগ করতে পারেন না। অথচ সিপিএম দলের উচ্চ নেতৃত্বও নির্দ্বিধায় আসর মাত করতে অশ্লীল শব্দকেই হাতিয়ার করছেন। তাঁদের দলের নেতা-কর্মীরাও এই আচরণকেই রাজনীতির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছেন। বিজেপি, তৃণমূল, কংগ্রেস ইত্যাদি দলের সাথে তথাকথিত এই বামপন্থীদের ঝান্ডার রং ছাড়া অন্য পার্থক্য থাকছে কোথায়?

বিপদটা এই যে, সিপিএমকেই বাজারের প্রতিষ্ঠিত সংবাদমাধ্যম একমাত্র বাম এবং কমিউনিস্ট হিসাবে তুলে ধরে। যেন তাদের দলের ভোট সংখ্যা বাড়া কিংবা কমাতেই বাম-সংস্কৃতি-রাজনীতির এগনো পিছানো নির্ভর করে। ফলে জনমানসে তাদের এই অভব্য, অশালীন আচরণই 'কমিউনিস্ট সংস্কৃতি' হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। যার দৌলতে বাজারি সংবাদমাধ্যম দক্ষিণপন্থী, সাম্প্রদায়িক ক্ষমতালোভী রাজনীতি ও সংস্কৃতির সঙ্গে বামপন্থাকে এক পংক্তিতে বসিয়ে দিতে পারে। এ ভাবে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে যায় 'সবাই সমান', ভোটের জন্য সকলেই যেমন খুশি আচরণ করতে পারে। এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হচ্ছে বামপন্থার। আশা করি নেতারা না বুঝলেও বামপন্থার প্রতি আকর্ষণ আছে সিপিএমের যে কর্মী-সমর্থকদের তারা কথাটা বোঝার চেষ্টা করবেন।

সুবর্ণ গুপ্ত, কলকাতা ৩১

রাজায় রাজায় যুদ্ধ শেষে অন্ধকারে পড়ে রইলেন যাঁরা

'সীমান্ত' কথাটা শুনলেই চোখের সামনে ভাসে কাঁটাতারের বেড়া, সেনাবাহিনীর কড়া নজরদারি, গুলি-গোলা-সংঘর্ষের ছবি। কোনও কারণে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হলে সংবাদমাধ্যমে, আলাপচারিতায় প্রতিনিয়ত উঠে আসে সীমান্ত, নিরাপত্তা, অনুপ্রবেশের মতো শব্দগুলো। অথচ যে মানুষগুলোর নিত্যদিনের বাস, রুজি-রোজগার এই সীমান্তে, তাঁদের জীবনটা কেমন? সে জীবনের নিরাপত্তাই বা কতটুকু? পহেলগামের নারকীয় ঘটনার পরে যখন দেশের সর্বত্র রাষ্ট্রের চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ উন্মাদনার ঢেউ, তখন সমাজমাধ্যমে ঘুরে ফিরে আসছিল একটি পুরোনো অথচ প্রাসঙ্গিক আপ্তবাক্য— 'যারা যুদ্ধ চায় তারা যুদ্ধে যায় না, যারা যুদ্ধে যায় তারা যুদ্ধ চায় না।' পহেলগাম পরবর্তী চার দিনের ভারত-পাক সংঘর্ষে দুই দেশের সীমান্ত অঞ্চলের যে সব মানুষের জীবন নতুন করে তছনছ হয়ে গেল, কিংবা ইরান-ইজরায়েল-আমেরিকার যুদ্ধ, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, গাজায় ইজরায়েলের লাগাতার হামলা সর্বস্বান্ত হলেন যাঁরা, তাঁরা কি এই যুদ্ধ চেয়েছিলেন?

উনিশ বছর বয়সে বিয়ে হয়ে কাশ্মীরের সীমান্তে পাল্লানওয়ালা গ্রামে এসেছিলেন কমলকুমারী। বহু অলস দুপুর-বিকেলে একা বসে কমল ভাবতেন, ওই যে সীমান্তের ওপাশে অন্য দেশের মানুষগুলো, যাদের আজানের সুর, বিয়ে বা অন্য উৎসবের শব্দ এপারে শোনা যায় প্রায়শই, তাঁদের জীবনটাও কি এমন বিপদসঙ্কুল? ওদেরও যখন তখন লুকিয়ে পড়ার জন্য বাঙ্কার আছে? যুদ্ধ লাগলেই ওদেরও ঘর ছেড়ে পালাতে হয় প্রাণ হাতে নিয়ে? কার্গিল যুদ্ধের পর কমল কুমারীদের গ্রাম প্রায় জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল। এবারের যুদ্ধের সময় কয়েক সপ্তাহ ধরে তাঁরা রাতে ঘরে থাকার সাহস পাননি, দশ কিলোমিটার পথ উজিয়ে এক আত্মীয়ের বাড়িতে রাত কাটাচ্ছিলেন, সেই কারণেই অন্তত প্রাণটুকু রক্ষা করতে পেরেছেন। কিন্তু বোমার আঘাতে ঘরের ছাদ ভেঙে পড়েছে, যে ঘর ২০১৪ সালেই নতুন করে তৈরি করেছিলেন তারা। সেই ধ্বংসস্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে কমল বলেন, 'যুদ্ধ যুদ্ধ করে যারা চিৎকার করছে, যুদ্ধ কী ভয়ানক জিনিস তারা জানে না। চোখের সামনে প্রিয়জনকে আহত হয়ে পড়ে যেতে দেখা, বাড়িঘর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া— যুদ্ধের এই ভয়াবহতা তারা দেখেনি।' কমলের পরিবার প্রাণে বাঁচলেও সেই সৌভাগ্য সবার হয়নি। রাজৌরিতে মারা গেছেন তিন জন, যার মধ্যে ছিলেন বিহারের এক বাসিন্দা এবং তার দু' বছরের শিশুকন্যা। পুঞ্চ এলাকায় উনিশ বছরের কিশোরী আফরিনের চোখের সামনেই বোমার টুকরো ঢুকে গেছে তার বাবার বুকে। বাবা পড়ে যাওয়ার আগে মেয়েকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছিলেন, তাই আফরিনের প্রাণটা বেঁচেছে। কিন্তু হাতে, মাথায় বোমার অংশ ঢুকে মারাত্মক আহত হয়েছে সে। আফরিনের বাবা বছর চল্লিশের আক্রম ছিলেন শ্রমিক, পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল মানুষ। সুস্থ সবল মানুষটি সবার চোখের সামনে এক মুহূর্তে এভাবে নেই হয়ে গেলেন, এখনও ভাবতে পারছেন না আক্রমের স্ত্রী ফরিদা। আফরিন সহ ছয় সন্তানকে নিয়ে আগামী জীবনটা কেমনভাবে চলবে, সবটাই অন্ধকার তার কাছে। রোজকার মতোই মাদ্রাসায় যাবেন বলে ৭ মে সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন পুঞ্চের আরেক বাসিন্দা মহম্মদ

সাতের পাতায় দেখুন

যে প্রশ্নগুলি তুলে দিল

তিনের পাতার পর

কোনও তোয়াক্কা না করে আমেরিকা ও ইজরায়েলের এই হামলা রাষ্ট্রপুঞ্জের গ্রহণযোগ্যতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতাকে তলানিতে ঠেলে দিল। এর জন্য ইউরোপের তথাকথিত শক্তিশালী দেশগুলির শাসকদের ভূমিকা কি কম? এর আগে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধেও দেখা গেছে, ইউরোপের ন্যাটোভুক্ত দেশগুলির বেশিরভাগই যুদ্ধ থামানোর কোনও প্রয়াস না নিয়ে চেষ্টা করে গেছে কী ভাবে এই যুদ্ধ থেকে ফয়দা তোলা যায় তথা এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নিজ নিজ দেশের অস্ত্রশিল্পকে চাঙ্গা করে তোলা যায়। এই যুদ্ধেও তাদের ভূমিকা আলাদা কিছু নয়। এই সব দেশের শাসকদের সুবিধাবাদী ভূমিকাই ইজরায়েল-আমেরিকাকে এমন এক অন্যায় যুদ্ধে নিশ্চিন্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে সাহায্য করেছে। ফ্রান্স এই ঝাঁকের মধ্যে একটা কেউকেটা দেশ। তার একটা দীর্ঘ সংগ্রামী ঐতিহ্য রয়েছে। তা সত্ত্বেও প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদের ধারক এই সব দেশগুলিকে নীতিহীনতা, পুঁজিপতি শ্রেণির মুনাফার স্বার্থ এতই নিচে নামিয়ে এনেছে যে অন্যায়কে অন্যায় বলার সাহসটুকুও তারা হারিয়ে ফেলেছে। ইরান যখন আমেরিকা-ইজরায়েলের দ্বারা মারাত্মক ভাবে আক্রান্ত তখন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাক্রঁ তাকেই উপদেশ দিচ্ছেন, সে যেন নিজেকে সংযত রেখে কূটনীতির রাস্তায় ফিরে আসে। ব্রিটেনে নাকি এখন প্রগতিশীল শ্রমিক দলের রাজত্ব। সেই দলের নেতা, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টার্মার একেবারে চড়া সাম্রাজ্যবাদী সুরে বলেছেন, ইরানকে কোনও ভাবেই নিউক্লিয়ার অস্ত্র তৈরি করতে দেওয়া যায় না। আমেরিকা নাকি সেই বিপদ দূর করতেই ব্যবস্থা নিয়েছে। স্টার্মারও ইরানকে বোঝাপড়ার টেবিলে বসতে এবং কূটনীতির পথে চলতে উপদেশ দিয়েছেন। বাস্তবে এই সব শক্তিধর দেশগুলির শাসকদের নীতিহীন আচরণই পরমাণু অস্ত্র প্রতিরোধ কর্মসূচিকে ভণ্ডামির স্তরে নামিয়ে এনেছে। এই ভণ্ডামিরই আর একটি দিক হল আক্রান্তের উপরই বোঝাপড়ার দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া।

ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি বলেছেন, আমরা শেষ দিন পর্যন্ত বোঝাপড়া করার চেষ্টা চালিয়েছি। বলেছেন, ইরান সেখানে কী করে ফিরে আসতে পারে যে জায়গাটা সে ছেড়েই যায়নি।

ভারত সরকারের ভূমিকা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ঐতিহ্যের বিরোধী

বিশ্বের তৃতীয় অর্থনৈতিক শক্তির অধিকারী হওয়ার দাবিদার ভারতের ভূমিকা একেবারেই অন্য রকম কিছু নয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী, যিনি নিয়ত নিজেকে বিশ্বগুরু হিসাবে প্রচার করতে পছন্দ করেন এবং ভারতকে বিশ্বমঞ্চের একটি অন্যতম শক্তি বলে প্রচার করেন, তাঁকে কিন্তু এই ঘটনায় গোটা বিশ্ব চোখ-কান বুঁজে থাকতেই দেখল। অথচ ইরান ভারতের এক পুরনো বন্ধু দেশ, যে বহু কঠিন সময়ে ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছে। অতীতে বহু বার কাশ্মীর প্রশ্নে রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছে। সেই ভারত ইরানের উপর মার্কিনী ভয়ঙ্কর হামলার বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারণ করল না। নিন্দা দূরের কথা, যুদ্ধ বিরতির কথাটিও প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতিতে ছিল না। বরং ইরানকেই উত্তেজনা না বাড়ানোর পরামর্শ দেন তিনি। ভারতের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার যে দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর এই আচরণে তাকেই নিচে নামানো হল। প্রধানমন্ত্রী যে শক্তিশালী ভারতের গর্ব করেন, তবে তা কীসের শক্তি? নৈতিক শক্তিকে বাদ দিয়ে কি কোনও শক্তি দাঁড়াতে পারে? প্রশ্নটি দেশের মানুষকেও আজ ভেবে দেখতে হবে। অবশ্য গাজায় হাজার হাজার নিরীহ শিশু-মহিলা সহ সাধারণ মানুষের গণহত্যা চালানোর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপুঞ্জের যুদ্ধবিরতি নিয়ে রেজলিউশনে যে স্বাক্ষর করেনি তার থেকে এর বেশি আর কী আশা করা যায়!

যুদ্ধ আটকাতে এগিয়ে আসতে হবে প্রতিটি দেশের জনগণকেই

পুঁজিবাদী দেশগুলি সকলেই আজ এই নীতিহীনতার নাম দিয়েছে নতুন বাস্তবতা। নীতি-নৈতিকতার কথা নাকি সেখানে অচল! সেখানে শুধুই নাকি এগিয়ে চলা! সবার আগে নাকি দেশের স্বার্থ! এই দেশ মানে তো পুঁজিপতি শ্রেণির ব্যবসায়িক লাভ-ক্ষতির স্বার্থ! অস্ত্র ব্যবসার স্বার্থ! কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে আর কোন ক্ষেত্রে করবে না সবই আজ নির্ধারিত পুঁজিপতি শ্রেণির ব্যবসার স্বার্থকে সামনে রেখেই। একেই তারা দেশের স্বার্থ বলে চালাতে চায়। আজ বিশ্বের প্রতিটি মানুষকে ভেবে দেখতে হবে, এর নাম কি এগিয়ে চলা? এ কোন দিকে আমাদের রাষ্ট্রনায়করা বিশ্বকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন— যে বিশ্বে নীতি-নৈতিকতার স্থান নেই, বিবেক-মানবতার স্থান নেই, শুধুই হিংসা আর পুঁজিপতি শ্রেণির মুনাফা। মুনাফার স্বার্থের কাছে সভ্যতার স্বার্থকে এ ভাবে বিসর্জন দেওয়াকে আটকানো যাবে কী ভাবে? সাম্রাজ্যবাদ যত দিন থাকবে তত দিন তারা বাজার দখল এবং অস্ত্র ব্যবসার স্বার্থে যুদ্ধ বাধিয়ে যাবে। তাই সত্যিকারের যুদ্ধ বিরোধিতা আসলে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা। যত দিন সমাজতন্ত্র ছিল তত দিন যুদ্ধের বিরুদ্ধে তা প্রধান প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করত। সমাজতন্ত্রের অনুপস্থিতিতে তাই দেশে দেশে জনগণের ঐক্যবদ্ধ জঙ্গি শান্তি আন্দোলনই যুদ্ধ ঠেকানোর একমাত্র রাস্তা। প্রবল শান্তি আন্দোলনই পারে দেশে দেশে যুদ্ধবাজ সরকারগুলিকে গণবিধ্বংসী যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার থেকে বিরত করতে।

যুদ্ধ শেষে অন্ধকারে পড়ে রইলেন যাঁরা

ছয়ের পাতার পর

ইকবাল। ফিরেছে তাঁর প্রাণহীন দেহ। এই আকস্মিক আঘাতে বিপর্যস্ত তাঁর পরিবার যখন মানুষটির শেষকৃত্যে ব্যস্ত, তখনই তাঁরা খবর পেলেন, বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে ইকবালের ছবি দিয়ে তাঁকে সেনার হামলায় নিহত পাকিস্তানি জঙ্গি বলে দাবি করা হচ্ছে। পুঞ্চ অঞ্চলের দীর্ঘদিনের বাসিন্দা ইকবাল ছিলেন স্থানীয় মাদ্রাসার শিক্ষক, শান্তিপ্রিয় ধর্মপ্রাণ মানুষ হিসেবে এলাকার মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। এমন একজনের নামে এত বড় মিথ্যে অপবাদ কী করে সংবাদমাধ্যমগুলো প্রচার করল, ভেবে পাচ্ছেন না ইকবালের ভাই, প্রিয়জনেরা। পরে পুঞ্চের পুলিশ বিবৃতি দিয়ে জানায় যে ইকবাল কোনও সন্ত্রাসবাদী ছিলেন না, একটি চ্যানেলও তাদের ভুল স্বীকার করে। কিন্তু ততক্ষণে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর ছবি দিয়ে সন্ত্রাসবাদী নিধনের ভুয়ো খবর। এই মিথ্যা প্রচারের ক্ষত ইকবালের মৃত্যুশোকের চেয়েও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে তাঁর পরিবারের কাছে। ইকবালের ভাই বলেছেন, 'সারা জীবন আমার দাদা ভারতে থাকলেন, মাদ্রাসায় পড়ালেন। আর মৃত্যুর পর দাড়ি আর টুপি দেখে ওরা তাঁকে সন্ত্রাসবাদী বানিয়ে দিল!' উরিতে মৃত্যু হয়েছে এক মহিলার, আহত হয়েছেন ১৫ জন, পঞ্চাশটিরও বেশি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বহু মা-বাবা সন্তানকে নিয়ে মাটির তলার বাঙ্কারে লুকিয়েছেন, কেউ প্রাণ হাতে করে ছুটেছেন, তাতেও নিজেদের দেহ আর জামাকাপড় ছাড়া কিছুই রক্ষা করতে পারেননি। কয়েক মিনিটের মধ্যে চোখের সামনে গুঁড়িয়ে গিয়েছে বহু কষ্টে গড়ে তোলা বাড়ি, মাটির তলায় ধুলো হয়ে মিশে গেছে ঘর-গেরস্তালি-বিছানাপত্র সবকিছু। অসংখ্য শিশু-কিশোরের মনে এই যুদ্ধ যে ভয়াবহ আতঙ্ক মানসিক বৈকল্য তৈরি করছে, কোনও যুযুধান দেশের সরকারি নেতামন্ত্রীরা কি তার দায় নেবেন?

প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, এই হামলা এবং পাল্টা হামলায় সীমান্ত এলাকার দশ হাজারেরও বেশি বাড়ি গুঁড়িয়ে গিয়েছে। পুঞ্চ, রাজৌরি, বারামুলার মতো সীমান্তের গ্রামগুলো সবচেয়ে ভয়ানক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শুধু পুঞ্চেই নব্বইটি পঞ্চায়েতের মধ্যে ষাটটি পঞ্চায়েতের হাজার হাজার বাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে, স্থানীয় সাংসদ ক্ষতিপূরণও দাবি করেছেন। কিন্তু এ দেশের সাধারণ মানুষ জানেন, ভয়ানক প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা যুদ্ধের ধ্বংসে তাঁদের ক্ষতি যতখানি নিশ্চিত, সরকারি ক্ষতিপূরণ জিনিসটা ততটাই অনিশ্চিত এবং অপ্রতুল।

শুধু ভারত অধিকৃত কাশ্মীর নয়, ক্ষতি হয়েছে পাঞ্জাব সীমান্তেও। ৭ মে-র বোমাবর্ষণে পাঞ্জাবের ভাতিন্দায় মারা গেছেন হরিয়ানার এক শ্রমিক এবং আহত হয়েছেন আরও ন'জন। কাশ্মীরের কমলের সুরেই ফিরোজপুরের দোকানি নিশান্ত সিং বলেছেন, 'যুদ্ধ কারও ভালো করে না। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কথাই ভাবুন। এই যুদ্ধ যে তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে চলবে, কেউ ভাবতে পেরেছিল? যুদ্ধ হোক, কখনোই চাইব না। একটা যুদ্ধ পাঁচ দিনে শেষ হবে, না পাঁচ বছর চলবে কেউ জানে না।' এই অনুভব আসলে দুই দেশের অসংখ্য সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষের উচ্চারণ, যুদ্ধের সাথে যাদের জীবনের কোনও সরাসরি সংযোগ নেই, অথচ রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রদর্শনের লড়াই বারবার যাদের জীবন-জীবিকাকে ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড় করায়।

পহেলগামের জঙ্গি হামলায় যে ছাব্বিশটি প্রাণ ঝরে গিয়েছে, তাঁদের মতোই সীমান্তের এই মানুষগুলোও ছিলেন ভারতীয় নাগরিক। অথচ এই বাইশজনের মৃত্যু, আরও অসংখ্য মানুষের আহত হওয়া, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি খুব কমই এসেছে খবরে। পহেলগামের ঘটনার পর প্রশ্ন উঠেছিল, কাশ্মীরের মতো সেনাবাহিনী অধ্যুষিত জায়গায় এমন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল কী করে? দেশের গোয়েন্দাবিভাগ, প্রতিরক্ষা দপ্তর কিছুই টের পেল না, এও কি সম্ভব? একেবারে কিছুই না জেনে থাকলে প্রধানমন্ত্রীর ১৯ মে-র কাশ্মীর সফর হঠাৎ বাতিল হল কেন? যে দেশে বছর বছর প্রতিরক্ষা খাতে বাজেট বাড়ানো হচ্ছে, সে দেশে সাধারণ মানুষের জীবনের নিরাপত্তার এই হাল কেন? ভারত-পাক যুদ্ধ এর আগেও হয়েছে, অথচ তাতে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ কিছুই দমন করা যায়নি। এবারেও রাষ্ট্রনায়করা যতই অভিযান চালিয়ে জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস করেছেন বা একে অন্যকে জব্দ করেছেন বলে দাবি করুন, পহেলগামের একজন জঙ্গিও আজ পর্যন্ত ধরা পড়েনি। অথচ ওই জঘন্য অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে সাজা দেওয়াই ছিল দেশের মানুষের একমাত্র দাবি। পহেলগামে নিহত শৈলেশ কালাথিয়ার স্ত্রী শীতল বলেছিলেন, 'সরকার আমাদের মাইনে থেকে ট্যাক্স কেটে নেয়, সব জায়গায় আমরা সরকারকে ট্যাক্স দিই। অথচ যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা নিরাপত্তা পান শুধু বড় ধনীরা। যখন আমার স্বামীর নিরাপত্তার দরকার ছিল, তখন কেউ এল না। আসলে এখানে নেতা-মন্ত্রীদের জীবনেরই দাম আছে, সাধারণ মানুষের জীবন মূল্যহীন।'

সীমান্তে এতগুলো মানুষের মৃত্যু এবং সাধারণ মানুষের জীবনের এই বিপুল ক্ষতিও আবার সেই প্রশ্নগুলোই তুলে দিল। এই দুর্ভোগ কি অনিবার্য ছিল? সরকার কি সীমান্তের সংঘর্ষপ্রবণ অঞ্চলের নাগরিকদের দায়িত্ব নিয়ে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারত না? বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর বলেছিলেন, পাকিস্তানকে জানিয়েই এই যুদ্ধ শুরু হয়েছে, তাঁর এই মন্তব্য নিয়ে অনেক বিতর্কও হয়েছিল স্বাভাবিকভাবেই। অথচ সীমান্ত এলাকায় এ দেশের যে মানুষগুলো বছরের পর বছর যুদ্ধের আতঙ্ক নিয়ে বাঁচেন, বারবার যাঁদের ঘর ভেঙে যায়, প্রিয়জনের মৃত্যু ঘটে, যুদ্ধ শুরুর আগে তাঁদের নিরাপত্তার কথা সরকার আদৌ ভাবল না। পাকিস্তানের মাটিতেও নিশ্চিত ভাবে এমন বহু নিরপরাধ মানুষ স্বজন হারিয়েছেন, হারিয়েছেন কষ্টার্জিত সম্পদ। দু'দেশের রাষ্ট্রনায়করাই পরস্পরকে সবক শেখানোর আনন্দে মেতে আছেন, কিন্তু দু'পারের এই সাধারণ মানুষগুলোর বিপুল ক্ষয়ক্ষতির হিসেব কেউ নিল না।

এরিখ মারিয়া রেমার্কের 'অল কোয়ায়েট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট' উপন্যাসে যুদ্ধের মাটিতে দাঁড়িয়ে এক তরুণ সৈনিক একটু একটু করে টের পেয়েছিল, শত্রুপক্ষের সৈনিকেরা বা অন্য দেশের সাধারণ মানুষ কেউ আসলে তার শত্রু নয়, তারা তারই মতো বিপন্ন, যুদ্ধবাজ শাসকের অসহায় শিকার। সময়, স্থান-কাল পাল্টে গেলেও পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ায় প্রাণঘাতী যুদ্ধের এই সার সত্য পাল্টায় না। এখানেই পহেলগামের বিধবা শীতল, পুঞ্চের পিতৃহারা আফরিন, পঞ্জাবের সুখবিন্দরের ছেলে যশবন্তের চোখের জল আর জীবনের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা বারবার মিলে মিশে যায়। কখনও প্রাকৃতিক দুর্যোগে, কখনও জঙ্গি হামলায়, কখনও যুদ্ধে, কখনও পাল্টা প্রত্যাঘাতে বারবার সব হারাতে হারাতে সাধারণ মানুষ টের পান, খিদে আর রুজিরুটির লড়াইয়ের আসলে কোনও সীমান্ত নেই।

(তথ্যসূত্রঃ দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, দি হিন্দু- ১৭মে)

সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘট

একের পাতার পর

পেনশন স্কিম' (ওপিএস) চালু করতে হবে ও সমস্ত কর্মচারীকে নিঃশর্তে তার আওতায় আনতে হবে। সমস্ত কাজকে কন্ট্র্যাকচুয়াল করার চক্রান্ত বন্ধকরতে হবে, 'ফিক্সড টার্ম এমপ্লয়মেন্ট'-এর মাধ্যমে কাজ হাসিল হলেই কর্মীদের ছাঁটাই করার নিষ্ঠুর ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে। দাবি উঠছে, সমস্ত স্কিম কর্মীদের সরকারি কর্মচারীর স্বীকৃতি ও উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে, সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিকের নিরাপত্তা, সুরক্ষা এবং ন্যায্য মজুরি ও স্থায়ী কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করতে হবে। সমস্ত ক্ষেত্রের অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য 'ওয়েলফেয়ার বোর্ড' গঠন করতে হবে এবং তাদের সকলের 'সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা' সুনিশ্চিত করতে হবে, সমস্ত গিগ ও প্ল্যাটফর্ম কর্মীদের শ্রমিকের স্বীকৃতি দিয়ে শ্রম আইনের আওতায় আনতে হবে, সকল বেকারের চাকরি অথবা চাকরি না হওয়া পর্যন্ত পর্যাপ্ত বেকার ভাতা দিতে হবে, কাজের অধিকারকে সংবিধানে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দিতে হবে, কর্মক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ সুনিশ্চিত করতে হবে।

এই সাধারণ ধর্মঘটের দাবি— খাদ্য, ওষুধ, গ্যাস, পেট্রল সহ সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে হবে, ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনে ৭০০-র বেশি কৃষকের জীবনদান এবং আরও অজস্র কৃষকের দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের শক্তিতে বাতিল হওয়া ৩ কালা কৃষি আইনকেই ঘুরপথে 'ড্রাফট ন্যাশনাল পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক অন এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং' রূপে চালু করার জঘন্য চক্রান্ত সম্পূর্ণরূপে বাতিল করতে হবে। 'C2 + 50%' ফর্মুলার ভিত্তিতে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) চালু করতে হবে। ধর্মঘটে দাবি উঠছে— শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক কেন্দ্রীকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ এবং সাম্প্রদায়িকীকরণ করার হীন চক্রান্ত নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি অবিলম্বে বাতিল করতে হবে, নারীদের ওপর আক্রমণ ও নির্যাতন বন্ধকরতে হবে, নারী নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে, অশ্লীলতা, মদ ও মাদক দ্রব্যের সম্প্রসারণ রোধ করতে হবে। যে ভাবে মোবাইলের প্রতি আসক্তি, যৌন আসক্তি ইত্যাদি সমাজের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দিচ্ছে এবং মানুষকে মনুষ্যত্বহীন করে তুলছে তা রুখতে হবে। এই সমস্যা বিশেষ করে ছাত্র এবং যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকট ভাবে দেখা দিচ্ছে, অবিলম্বে এই সাংস্কৃতিক অবক্ষয় রুখতে সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হবে।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে ৭৮ বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতা এ কথা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, বেঁচে থাকার ন্যূনতম দাবি আদায় করতে হলে মেহনতি জনতার সামনে শক্তিশালী সংগঠিত ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া আর কোনও পথ খোলা নেই। ভারত একটি তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশ হলেও মুষ্টিমেয় ধনী এবং অসংখ্য দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য বাড়তে বাড়তে এক ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে। সমগ্র জনসংখ্যার মাত্র ৫ শতাংশের হাতে জমা হয়েছে শ্রমজীবী মানুষের কঠিন শ্রমের ফসল দেশের ৭০ শতাংশ সম্পদ, অথচ এই সম্পদের মাত্র ৩ শতাংশের ওপর নির্ভর করে দিন কাটাচ্ছে দেশের ৫০ শতাংশ মানুষ।

এই সংকটময় পরিস্থিতির মোকাবিলায় সাধারণ ধর্মঘটের ঘোষণা এক বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে এসেছে। শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হলে মেহনতি জনতার সংগ্রামী ঐক্য প্রয়োজন— জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা নির্বিশেষে শ্রমিক, খেতমজুর, গরিব চাষি, গ্রাম ও শহরের মধ্যবিত্ত, সাধারণ মানুষের সংগ্রামী ঐক্য একান্ত প্রয়োজন। শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থে ও তাদের বিপুল মুনাফা অটুট রাখতে তাদের সেবাদাস সরকার, প্রশাসন ধারাবাহিক ভাবে চেষ্টা করে চলেছে এই ঐক্যকে ভেঙে দিতে। সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের অবশ্যকর্তব্য এই সংগ্রামী ঐক্যকে চোখের মণির মতো রক্ষা করা এবং আরও বলিষ্ঠ ভাবে গড়ে তোলা। দেশের সাধারণ নাগরিকদের নিজেদের স্বার্থেই এ কথা উপলব্ধি করতে হবে যে, তাদের দেশপ্রেম এবং দেশের প্রতি আবেগকে উগ্র জাতীয়তাবাদী হাওয়া তুলে দেশের মেহনতি মানুষের ঐক্য ভাঙার কাজে শাসক শ্রেণি ব্যবহার করতে চাইছে। ইউক্রেনের ওপর রাশিয়ার আগ্রাসী যুদ্ধ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদতপুষ্ট ইহুদিবাদী ইজরায়েলের প্যালেস্টাইনের ওপর আক্রমণ এবং দখলদারি, ইরানের ওপর ইজরায়েল-মার্কিন আক্রমণ এ কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে যে, যুদ্ধের দ্বারা কেবলমাত্র সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকা ধ্বংস হয়। আজকের দিনে পুঁজিবাদের যুদ্ধ পরিস্থিতি প্রয়োজন, তার প্রয়োজন ক্রমাগত চলতে থাকা আঞ্চলিক যুদ্ধ, যার মধ্য দিয়ে অর্থনীতির সম্পূর্ণ সামরিকীকরণ করা সম্ভব হবে, জীবনের প্রধান সমস্যাগুলি থেকে জনগণের দৃষ্টি সরিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে এবং এই সুযোগে মুষ্টিমেয় ধনকুবের গোষ্ঠী অবাধে মুনাফা লুঠতে পারবে। তাই আমরা সকল শ্রমজীবী মানুষ এবং সাধারণ জনগণের কাছে ঐকান্তিক আবেদন জানাচ্ছি— ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, আঞ্চলিকতা, জাতি ইত্যাদি নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়ান এবং বিভেদ সৃষ্টিকারী ও আন্দোলনবিরোধী সকল শক্তির ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করতে এগিয়ে আসুন। ৯ জুলাই সাধারণ ধর্মঘটকে সর্বাত্মক সফল করে তুলুন। নিজেদের জীবন-জীবিকার ন্যায্য দাবি আদায়ে আরও বিস্তৃত, ঐক্যবদ্ধ, ধারাবাহিক এবং শক্তিশালী আন্দোলনের পথ প্রশস্ত করতে সচেষ্ট হোন।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2025-27

গণদাবী GANADABI Volume: 77, No.: 47 Bengali Weekly July 4, 2025 Kolkata Price: Rs. 3.00

শহিদ বিরসা মুণ্ডা মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

৯ জুন ছিল শহিদ বিরসা মুণ্ডার ১২৫তম মৃত্যুবার্ষিকী। এই উপলক্ষে অল ইন্ডিয়া জন অধিকার সুরক্ষা কমিটির আহ্বানে পশ্চিমবঙ্গের ১৮টি জেলায় গভীর শ্রদ্ধার সাথে সপ্তাহব্যাপী নানা কর্মসূচি পালিত হয়। এই উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠানে সেই সময়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থা গরিব শোষিত মানুষের উপর জমিদার, মহাজন, আড়কাঠি, ঠিকাদার, ব্রিটিশ শাসকদের শোষণ, জুলুম, অত্যাচার এবং তার প্রতিকারে ধারাবাহিক আন্দোলন এবং তারই ধারাবাহিকতাতে বিরসা মুণ্ডার নেতৃত্বে সংগঠিত ১৮৯৫ থেকে ১৯০০ সালের আদিবাসী কৃষক বিদ্রোহ 'উলগুলান' সম্বন্ধে আলোচনা হয়। এই আন্দোলনগুলির মধ্য দিয়ে ছোটনাগপুর টেন্যান্সি অ্যাক্ট, সান্তাল পরগণা টেন্যান্সি অ্যাক্ট, উইলকিনসন্স রুলস প্রভৃতি আইনি অধিকার অর্জন করেছিল আদিবাসী সহ ওই অঞ্চলের সমস্ত গরিব মানুষ।

বক্তারা ক্ষোভের সাথে বলেন, স্বাধীন ভারতের সরকার অর্জিত এই সকল অধিকারগুলি বারে বারে খর্ব করেছে এবং এখনও খর্ব করার চেষ্টা করে চলেছে। ড্যাম, রাস্তা, রেলপথ, খনি, কারখানা গড়ে তোলার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ উচ্ছেদ হয়েছে। কিন্তু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়নি। স্বাধীন ভারতে বন (সংরক্ষণ) আইন-১৯৮০' চালু করতে গেলে প্রায় এক কোটি মানুষ উচ্ছেদের সম্মুখীন হয়। তার বিরুদ্ধে আদিবাসী, চিরাচরিত বনবাসী, গরিব শোষিত মানুষ এবং শুভবুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিকদের সংগঠিত প্রতিরোধ আন্দোলনের ফলে এই সকল অধিকার অনেকাংশে রক্ষিত হয়েছে এবং অরণ্যের অধিকার আইন-২০০৬ এর মতো আইনি অধিকার অর্জিত হয়। কিন্তু এই অধিকারগুলি খর্ব করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এই সকল আইনে একের পর এক সংশোধনী নিয়ে আসে। কিন্তু গণ-আন্দোলনের চাপে পিছু হটতে বাধ্য হয়।

অতি সম্প্রতি সাধারণ মানুষের অধিকার হরণকারী বন সংরক্ষণ রুল-২০২২ এবং বন (সংরক্ষণ) সংশোধনী আইন-২০২৩ চালু করার মধ্য দিয়ে এক দিকে যেমন বন অধিকার আইন-২০০৬-এর ক্ষমতা কার্যত নিশেঃষিত করেছে অপর দিকে জঙ্গলকে কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়ার পথ পরিষ্কার করেছে। গাছ কেটে জঙ্গল ধ্বংস করার পথও পরিষ্কার হয়েছে। এই সংশোধনী আইন কার্যকর হলে, পরিবেশের বিপন্নতা আরও বাড়বে। এর বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে প্রতিবাদ আরও তীব্র করতে হবে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মৃত্যুশতবর্ষ উপলক্ষে আলোচনা সভা

ডায়মন্ডহারবার ঃ স্বাধীনতা আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য চরিত্র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুশতবর্ষ উপলক্ষে রিলিফ অ্যান্ড পাবলিক ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ডায়মন্ডহারবার মহকুমা শাখার উদ্যোগে মাধবপুর উজান কালচারাল অ্যাকাডেমিতে ২২ জুন আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী ও কবি দিলীপ বন্ধু হালদার। উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর সংগঠনের ডায়মন্ডহারবার মহাকুমা শাখার আহ্বায়ক সঞ্জয় মণ্ডল সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও দেশবন্ধু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা শুক্লা দে চৌধুরী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জীবন সংগ্রামের নানা দিক তুলে ধরেন। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন প্রবীণ শিক্ষক অনুকূল মণ্ডল।

রঘুনাথগঞ্জ ঃ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুশতবর্ষ এবং বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলামের ৫০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ প্রতিবন্ধী ঐক্য মঞ্চের পক্ষ থেকে অষ্টম রক্তদান শিবির ও কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয় মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ হাইস্কুলে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফাজিলপুর প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক মাসুদ শেখ, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমীর কান্তি রায়, উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবন্ধী ঐক্য মঞ্চের রাজ্য কর্মসমিতির সদস্য যুধিষ্ঠির গড়াই, সংগঠনের জেলা সভাপতি বর্জাহান শেখ, সংগঠনের সম্পাদক সুমন পাল।

জরুরি অবস্থার ৫০তম বার্ষিকীতে সভা আমেদাবাদে

জরুরি অবস্থার ৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে গুজরাটের আমেদাবাদে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস জরুরি অবস্থা জারি করে কীভাবে গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করেছিল তা নেতৃবৃন্দ তুলে ধরেন। বিজেপির পূর্বসূরি আরএসএস ছিল জরুরি অবস্থার সমর্থক। নেতৃবৃন্দ বলেন, বর্তমানে মোদি শাসনে কার্যত অঘোষিত জরুরি অবস্থা চলছে। মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস, মুভমেন্ট ফর সেকুলার ডেমোক্রেসি, পিইউসিএল, সিটিজেন্স ফর ডেমোক্রেসি এবং গুজরাট লোকসমিতির যৌথ উদ্যোগে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জে পি আন্দোলনের প্রবীণ ব্যক্তিত্ব প্রকাশভাই এন শাহ। বক্তব্য রাখেন দ্বারিকানাথ রথ, কিশোরীভাই দেশাই, মহাদেব বিদ্রোহী, রজনীভাই দাভে, মুকুন্দভাই পাণ্ড্য, মাসুম সান্যাল প্রমুখ।

আইন কলেজে ছাত্রী-ধর্ষণের প্রতিবাদে যুবমিছিল জয়নগরে

কসবায় আইন কলেজে ছাত্রী ধর্ষণের প্রতিবাদে ২৯ জুন দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর-মজিলপুর শহরে এ আই ডি ওয়াই ও-র নেতৃত্বে এক প্রতিবাদ মিছিল শহর পরিক্রমা করে। সংগঠনের পক্ষ থেকে দোষীদের কঠোর শাস্তি দাবি করা হয়।

স্মার্ট মিটার লাগানোর কেন্দ্রীয় ফরমানের বিরুদ্ধে

রাজভবন অভিযানের ডাক

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর বলেছেন, স্মার্ট মিটার লাগাতেই হবে। তাঁর এই ফতোয়ার তীব্র বিরোধিতা করেছে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (অ্যাবেকা)। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস ২৬ জুন এক প্রেস বিবৃতিতে জানান,

কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী যতই স্মার্ট মিটার লাগানোর উপর জোর দিন না কেন, বিদ্যুৎ পরিষেবা যৌথ তালিকাভুক্ত। ফলে পশ্চিমবঙ্গে স্মার্ট মিটার লাগানো চলবে না। রাজ্য সরকারকে সুস্পষ্ট ঘোষণা করতে হবে যে কোনও ভাবেই এ রাজ্যে গৃহস্থ, আবাসন, দোকানদার, ক্ষুদ্র শিল্প ও কৃষিতে গ্রাহক স্বার্থবিরোধী স্মার্ট মিটার লাগানো হবে না। লাগিয়ে দেওয়া সমস্ত স্মার্ট মিটার অবিলম্বে খুলে নিতে হবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের বেসরকারিকরণ, বাণিজ্যিকীকরণের বিরুদ্ধে সারা দেশব্যাপী গ্রাহকদের স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান চলছে। আগামী ২ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি রাজ্যপালের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ স্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকলিপি কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হবে। তিনি রাজ্যের জনগণকে ব্যাপক ভাবে স্বাক্ষর কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের আবেদন জানান।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com